প্রস্তাবনা।

—o—

রাজ্ঞী অহল্যাবাইয়ের জীবনচরিত বঙ্গীয় পাঠক-বর্গের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে। স্বর্গীয় বাবু নীল-মণি বশাক ইহা সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার "নবনারী" নামক গ্রন্থে বিবৃত করেন। তাঁহার পর আরও দুই-এক জন বঙ্গীয় লেখক ইহা প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ পুণ্য-চরিতা রমণীর জীবন বৃত্তান্ত যতই আলোচিত ও সাধারণের পরিচিত হয় ততই মঙ্গল, ভাবিয়া, আমি ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। ইহার সম্বন্ধে মৌলিক

অনুসন্ধানের কোন গৌরবই আমার প্রাপ্য নহে। সার্ জন ম্যাল্কম কৃত "মধ্য-ভারত ও মালবদেশের ইতিহাস" এবং "হোলকরাঁচী কৈফিয়ৎ" নামক মহারাষ্ট্র বখর (ইতিহাস) অবলম্বনে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থখানি মহারাষ্ট্র ভাষায় লিখিত ;—আমি মহারাষ্ট্র ভাষায় অভিজ্ঞ নহি ; ইহার অনুবাদের জন্য আমি আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান সখারাম গণেশ দেউস্করের নিকট কৃতজ্ঞ আছি। মহারাষ্ট্র দেশ পরিভ্রমণ কালে, তিনি এই গ্রন্থ আমার জন্য সংগ্রহ করিয়া আনেন, এবং তাহার আবশ্যকীয় অংশ অনুবাদ করিয়া দেন। "ঐতিহাসিক গোষ্টী" নামক একখানি গ্রন্থ হইতেও তিনি অহল্যার সম্বন্ধে দুইটী আখ্যায়িকা ও আকওয়ার্থ সাহেবের সংগৃহীত গাথাবলী হইতে একটী গাথা আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই সকলের জন্য আমি তাঁহার নিকট সস্নেহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

মহারাষ্ট্র বখর খানি যথা সময়ে হস্তগত না হওয়ায়, তাহাতে উল্লিখিত অনেক কথা আমরা উপযুক্ত স্থলে সন্নিবেশ করিতে না পারিয়া, পরিশিষ্টাকারে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছি। সারজন ম্যাল্কমের ইতিহাসের অনুসরণ করাতে মহারাষ্ট্র নামগুলির লিখন সম্বন্ধেও

বিকৃতি ঘটিয়াছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই সকল ত্রুটী সংশোধনের চেষ্টা করিব। অশুদ্ধ নামগুলির একটী তালিকা সম্প্রতি প্রদত্ত হইল। *

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভোঁস্‌লা	... ভোঁস্‌লে	কুন্দজী	... খণ্ডুজী
মলহর	... মহ্লার	টালান্দা	... তলোদেঁ
নম্বলকর	... নিম্বালকর	কুন্দ রাও	... খণ্ডে রাও
কুম্ভীর দুর্গ	... কুম্ভেরী দুর্গ	মল্ল রাও	... মালে রাও
রাঘব দাদ্দা	... রাঘোবা দাদা	মধুজী সিন্ধিয়া	... মাহাদজী সিন্দে
জন্মু জী	... জানোজী ভোঁস্‌লে	মধু রাও	... মাধব রাও
তুকাজী	... তুকোজী রাও	হুলকার	... হোলকর
মিসির	... মহেশ্বর ক্ষেত্র।		

ভারতের বিভিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে সদ্ভাব সম্বর্দ্ধনের জন্য, তাঁহাদিগের পরস্পরের সম্মিলন যেরূপ আবশ্যক, তত্তদ্দেশীয় মহা পুরুষদিগের চরিত্র আলোচনাও সেরূপ প্রয়োজনীয়। প্রকৃত মহাপুরুষগণ কোনও একটী জাতির বা দেশের একাধিকৃত নহেন। তাঁহারা সকল দেশের ও সকল জাতিরই জন্য;—সংযোগসূত্র রূপে তাঁহারা বিভিন্ন মানব সমাজকে সম্বদ্ধ করেন। অহল্যার জীবন চরিত

---

* মহ্লার রাওয়ের মাতুলের নাম—স্যার জন ম্যালকম লিখিয়াছেন, "নারায়ণজী;" বখরে আছে,—"ভোজ রাজজী।"

আলোচনা করিয়া, যদি একটীও বঙ্গ সন্তান মহারাষ্ট্র জাতির প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান হন, এবং একটীও বঙ্গ-মহিলা, তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি পূর্ব্বক, আত্মোন্নতির চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমার উদ্যম সার্থক হইবে।

অহল্যা বাই প্রথমে "দাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে সাধারণের সমীপে অর্পিত হইতেছে। ইতি।

বৈদ্যনাথ, দেওঘর,
শ্রাবণ ১৩০২। গ্রন্থকার।

সূচী-পত্র।

——(ঃ)——

উপক্রমণিকা।

সূচনা — মহারাষ্ট্রীয় জাতি — হোলকর বংশ — মহ্লার রাও হোলকর — তাঁহার বাল্যকাল — ভাগ্যোদয় — মালবের শাসন ভার প্রাপ্তি — দিগ্বিজয় — পাণিপতের যুদ্ধ — মৃত্যু ও চরিত্র সমালোচন। ১—১৬

প্রথম অধ্যায়।

অহল্যাবাই — পরিচয় — রাজ্যভার প্রাপ্তি — পুত্রের দুর্ব্বৃত্ততা — পুত্র বিয়োগ — গঙ্গাধর যশোবন্তের বিদ্রোহ — অহল্যার নির্ভীকতা — তুকোজীর প্রতি রাজ্য শাসনের ভার প্রদান। ১৭—৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অহল্যা ও তুকোজী — অহল্যার রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ—কর্ত্তব্য জ্ঞান ও তৎ সম্বন্ধে স্যারজন ম্যালকমের মত — দৈনন্দিন কার্য্য — ধর্ম্মচর্য্যা — রাজ্যের শান্তিরক্ষা — উদারতা — প্রজাগণের সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনের

চেষ্টা — পরার্থপরতা — ভীল দমন — দানধর্ম্ম ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান — তীর্থক্ষেত্রে অহল্যার কীর্ত্তি— জীবানুকম্পা — সমসাময়িক রাজন্যবর্গের সহিত তুলনা — অহল্যার সম্বন্ধে সাধারণের শ্রদ্ধা। ৩৩—৫৭

তৃতীয় অধ্যায়।

কন্যা মুক্তা বাইয়ের চিতারোহণ — অহল্যার শোক — জামাতা ও কন্যার স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ — অহল্যার আকৃতি — আনন্দী বাইয়ের সৌন্দর্য্যাভিমান — অহল্যার প্রকৃতি — তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়ম সম্বন্ধে সাধারণের শ্রদ্ধা — সমগ্র জীবনীর স্থূল নিষ্কর্ষ ও উপদেশ — উপসংহার। ৫৮—৭৪

পরিশিষ্ট।

হোলকরাঁচী কৈফিয়তের অনুবাদ ... ১—২৪
ঐতিহাসিক-গোষ্টীর অনুবাদ ... ২৪—২৯
অহল্যার সম্বন্ধে একটী গাথা। ... ৩০—৩৩

অহল্যা-বাই।

উপক্রমণিকা।

যে মনস্বিনী মহিলার জীবন-চরিত সঙ্কলনে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি,তাঁহার নাম ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র সুপরিচিত। উত্তরে হিমালয়শিখরস্থিত কেদারনাথ, দক্ষিণে সাগর-কূলবর্ত্তী রামেশ্বর, পশ্চিমে আরব-সমুদ্রবিধৌত দ্বারাবতী এবং পূর্ব্বে বঙ্গসাগরসমীপস্থ জগন্নাথক্ষেত্র, এই চতুঃসীমান্ত-র্ব্বর্ত্তী ভূভাগের মধ্যে এরূপ প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র, বোধ হয়, অতি অল্পই আছে, যেখানে রাণী অহল্যার কোন না কোনরূপ কীর্ত্তি বর্ত্তমান নাই। কোথাও

রাজপথ, কোথাও দেবমন্দির, কোথাও অতিথিশালা, কোথাও বা স্নানার্থ অবতরণিকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া, তিনি ভারতবাসী হিন্দুসন্তানমাত্রকেই কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভৌতিক কীর্ত্তিসমূহ যদিও ক্রমশঃ জীর্ণ এবং বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাঁহার অপার্থিব গৌরব কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। তিনি কাহারও প্রশংসাপ্রার্থিনী ছিলেন না, তথাপি তাঁহার কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসিগণ তাঁহাকে এখনও দেবীর ন্যায় সম্মান করেন; এবং তাঁহার নাম উচ্চারিত হইবামাত্র যেন এক অভূতপূর্ব্ব ভক্তিরসে শ্রোতার হৃদয় আপ্লুত হয়। তাঁহার একটী প্রধান কীর্ত্তিক্ষেত্র গয়াধামের বিষ্ণুমন্দিরে তাঁহার শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি দেবোচিত সম্মানে অর্চ্চিত হইয়া থাকে। তাঁহার পবিত্র জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে পুণ্যলাভ হয়। সংক্ষিপ্ত হইলেও, সেই জন্য, আমরা তাহা বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিবার বাসনা করিয়াছি।

রাণী অহল্যার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি যে-দেশে, যে জাতিতে এবং যে বংশে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। মহারাষ্ট্র জাতির নাম বঙ্গীয় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই পরিচিত। এই মহারাষ্ট্র জাতির শাখা বিশেষ,

এক সময় "বর্গী" * নামে, বঙ্গের নরনারীমাত্রেরই ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। রাণী অহল্যা এই মহারাষ্ট্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরে নর্ম্মদা নদী, পশ্চিমে আরব সমুদ্র, দক্ষিণে পর্টুগীজ অধিকৃত প্রদেশ, এবং পূর্ব্বে তুঙ্গভদ্রা নদী, এই চতুঃসীমান্তর্গত ভূভাগের সাধারণ নাম মহারাষ্ট্র। দেশের নামানুসারে এখানকার অধিবাসিগণ মহারাষ্ট্র, বা চলিত ভাষায়, মারাঠ্ঠা, বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মহারাষ্ট্র জাতি সহিষ্ণুতা, দৃঢ়চিত্ততা ও শৌর্য্য প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং অনেক মনস্বী পুরুষ ও মনস্বিনী মহিলা, মহারাষ্ট্র কুলে জন্মগ্রহণ করাতে, ইহার নাম দাক্ষিণাত্যবাসী আর্য্যসমাজের গৌরবস্থল হইয়াছিল। প্রসিদ্ধনামা ছত্রপতি শিবাজীর সময়েই মহারাষ্ট্রগণের জাতীয় উন্নতির প্রকৃত সূত্রপাত হয়। শিবাজীর ন্যায় মহাপুরুষ ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দুই শত বৎসরেরও অধিক হইল, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু

* মহারাষ্ট্র ভাষায় "বারগীর" শব্দের অর্থ অশ্বারোহী;—মহারাষ্ট্র জাতীয় ভোঁসলা রাজগণের অশ্বারোহী সৈনিকগণ বঙ্গদেশের অনেক স্থল লুণ্ঠন করিত বলিয়া, বর্গী নাম এদেশে সকলেরই পরিচিত এবং মহারাষ্ট্র শব্দের সহিত সমার্থবোধক হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র চক্রে তিনি একবার যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহার বলে তাহা এখনও ঘূর্ণিত হই-তেছে। যে সময় দিল্লীর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট আরঙ্গজেব হিন্দুরাজ্যসমূহ বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে সময় একা তিনিই কেবল ভারতভূমিতে এক অভিনব হিন্দু-রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পুরুষকার বলে মনুষ্য কিরূপ আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারে, শিবাজীর জীবন তাহার অতি সুন্দর প্রমাণস্থল। শিবাজীর আবির্ভাবের সঙ্গে মহারাষ্ট্র দেশে আরও অনেক খ্যাতনামা বীর পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং শিবাজীর ন্যায় তাঁহারাও, অতি সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, আপনাদিগের উদ্যমবলে পরিণামে এক একটী নূতন রাজ্য ও রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। অনেকের বংশ-ধরেরা মহারাষ্ট্র দেশে এখনও রাজত্ব করিতেছেন। এই সকল স্বনামখ্যাত বীরপুরুষগণের মধ্যে মলহররাও হুলকারের নাম অতি প্রসিদ্ধ। আমরা যাঁহার জীবনচরিত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই দেবীরূপিণী রাণী অহল্যা ইহাঁরই পুত্রবধূ। সেই জন্য আমরা প্রথমে মলহররাও-য়ের পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইব।

রাণী অহল্যার শ্বশুর মলহাররাও অতি সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার

বংশের নাম কাহারও পরিচিত ছিল না। জাতিগত ব্যবসায় অনুসারে তাঁহাদিগের বংশ "ধনগর" অথবা পশুপাল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মলহররাওয়ের পিতা কুন্দজী পুনা হইতে বিংশতি ক্রোশ দূরে "হোল্" নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিতেন। পশুপালন এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। মহারাষ্ট্র ভাষায় "কর্" শব্দের অর্থ অধিবাসী। কুন্দজীর বংশধরগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের আদি বাসস্থান হোল গ্রামের নামানুসারে "হোল্কর" অথবা "হুল্কার" খ্যাতি লাভ করিয়াছেন*।

মলহররাও হোল্কার খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার চার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা কুন্দজীর মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর, মলহররাওয়ের মাতা, জ্ঞাতিগণের সহিত বিসম্বাদবশতঃ, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, শ্বশুরভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আপনার ভ্রাতা নারায়ণজীর আশ্রয়ে বাস করিতে যান। নারায়ণজী খান্দেশের অন্তর্গত টালান্দা নামক একটী পল্লীতে বাস করিতেন। সেখানে তাঁহার কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, এবং তিনি কোন মহারাষ্ট্র সামন্তের অধীনে কতক-

* অনেক মহারাষ্ট্র পরিবারই বাসস্থানের নামানুসারে এইরূপ "নিম্বলকর," "পত্তনকর," "নগরকর," ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ।

গুলি অশ্বসৈনিকের নায়কত্ব করিতেন। স্বজাতির রীতি অনুসারে তিনি বালক ভাগিনেয়কে আপনার পশুপাল রক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। এই অবস্থায় বালক মলহর-রাওয়ের সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত ঘটনা শ্রুত হওয়া গিয়া থাকে।* পশুচারণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া, তিনি একদিন একটী বৃক্ষমূলে নিদ্রা যাইতেছিলেন। পত্রের অন্তরাল দিয়া সূর্য্যালোক তাঁহার মুখের উপর অল্প অল্প নিপতিত হইতেছিল। একটী বিষধর সর্প দেখিতে পাইয়া, ফণা বিস্তার পূর্ব্বক, তাঁহাকে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিতে লাগিল, এবং মলহররাও জাগ্রত হইলে তাঁহার কোন অনিষ্ট না করিয়া, ধীরে ধীরে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। অন্যান্য রাখাল বালক ও নারায়ণজীর প্রতিবাসিগণ এই দৃশ্যে বিস্মিত হইলেন এবং বালক মলহররাওয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা করিতে লাগিলেন। ঘটনা ক্রমশঃ নারায়ণজীর কর্ণ-গোচর হইলে, তিনি একজন দৈবজ্ঞকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞ বলিলেন, যে এই বালক ভবিষ্যতে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবেন। নারায়ণজী

* এরূপ ঘটনা ভারতবর্ষের আরও অনেক রাজবংশের আদি-পুরুষদিগের সম্বন্ধে শ্রুত হওয়া যায়।

শুনিয়া ভাগিনেয়কে মেষচারণ কার্য্য হইতে বিরত করিলেন এবং আপনার অধীনস্থ অশ্বসৈনিক দলে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। এক একটী সামান্য ঘটনা হইতে অনেক সময় মনুষ্যের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ পরিস্কৃত হয়; বালক মলহররাওয়েরও সম্বন্ধে তাহাই ঘটিল। যেদিন তিনি দৈবজ্ঞের মুখে অবগত হইলেন, যে বিধাতা তাঁহাকে কোন মহৎ কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে নূতন আশা ও নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইল। মাতুলের অশ্বসৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি প্রগাঢ় উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এখনকার ন্যায় তখন ভারতসন্তানগণ নির্ব্বীর্য্য ও নিরস্ত্র হন নাই। শারীরিক বল, শৌর্য্য, ক্লেশসহিষ্ণুতা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণ, যাঁহার যে পরিমাণে থাকিত, তিনি সেই পরিমাণে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেন। মলহররাও যে সমাজে এবং যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত নিত্য কর্ম্মের মধ্যেই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; সুতরাং বীরপুরুষের পক্ষে কার্য্যক্ষেত্রের অভাব ছিল না। একটী যুদ্ধে যুবক মলহররাও, সুপ্রসিদ্ধ নিজামউল্‌মুল্কের একজন খ্যাতনামা সেনাপতিকে নিহত করাতে তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল, এবং তাঁহার মাতুল নারায়ণজী

তাঁহাকে সমাদরে আপন কন্যাদান করিলেন।*

মলহররাওয়ের সৌভাগ্যের ভিত্তি এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিরূপে বালক মলহররাও মেষপালকের কার্য্য হইতে একটী বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইলেন, তাহা আদ্যোপান্ত বিবৃত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়। কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও, তাহা আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ের পক্ষে অতি-দীর্ঘ হইবে। কখনও বীর্য্য, কখনও বুদ্ধিমত্তা, কখনও কপটতা, কখনও বা রাজনীতি-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া, তিনি আপনার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কৃত করিয়া লইলেন। তাঁহার সাহস ও বীরত্বের কথা শুনিয়া, মহারাষ্ট্র সমাজের তদানীন্তন নেতা, পেশোয়া বাজীরাও তাঁহাকে আপনার অধীনস্থ পাঁচশত অশ্বসৈনিকের অধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন। মলহররাও নূতন প্রভুর অধীনে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন; ভাগ্যলক্ষ্মীও তাঁহার প্রতি উত্তরোত্তর প্রসন্না হইতে লাগিলেন। তাঁহার বিক্রমবলে নিজাম-আলি নামে পেশোয়ার একজন মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত

---

* দাক্ষিণাত্যের অনেক জাতির মধ্যে, এমন কি কোন কোন স্থানের ব্রাহ্মণ সমাজেও, এরূপ স্বসম্পর্কীয় বিবাহ প্রচলিত আছে। অনেক স্থলে তাহা শ্রেষ্ঠ এবং অভাব পক্ষে অন্যরূপ বিবাহ নিকৃষ্ট শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হয়।

হইলেন, এবং পর্ত্তুগীজ দস্যু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত কঙ্কন দেশ শান্তিলাভ করিল। তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া, বাজীরাও, ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মদার উত্তর কূলস্থ দ্বাদশটী প্রদেশ তাঁহাকে জাইগীর স্বরূপ দান করিলেন এবং ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে আরও সোত্তরটী প্রদেশ সেই সঙ্গে সংযোজিত করিয়া দিলেন। এই সময় মালব দেশ লইয়া মুসলমানদিগের সহিত মহারাষ্ট্রগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। মলহর-রাও সেই যুদ্ধে এরূপ বুদ্ধিমত্তা ও বিক্রম প্রকাশ করিলেন, যে বাজীরাও, তাঁহার গুণে একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে মালব সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, এবং অবশেষে মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ হইলে, মলহর রাওয়ের সৈন্যগণের ভরণ পোষণার্থ তাঁহাকে ইন্দোর প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ দান করিলেন। ইন্দোর সেই অবধি হোল্‌কার বংশীয়গণের রাজধানী হইয়াছে।

যে বালক, এক সময় গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে তপ্ত এবং বর্ষার জলে সিক্ত হইয়া, পশুচারণ করিতেন, এইরূপে তিনি একটী বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইলেন। মালব-বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, মলহররাও মহারাষ্ট্র চক্রের পরিচালকত্ব করিয়া গিয়াছেন। তখন মোগল-সাম্রাজ্যের ভগ্নাবস্থা। দিল্লীশ্বরদিগের সেই পূর্ব্ব

গৌরব, পূর্ব্ব প্রতাপ অন্তর্হিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র-গণের হস্ত হইতে নিরাশ্রয় প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন, তখন আর তাঁহাদিগের সেরূপ সামর্থ্য ছিল না। সৌভাগ্যের দিনে মুসলমান সম্রাটগণ তাঁহাদিগের হিন্দু প্রজাগণের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রগণ এক্ষণে পূর্ণমাত্রায় তাহার প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিলেন। কখনও কোন কোন মস্‌জিদ চূর্ণ করিয়া, কখনও বা মুসলমান সাধুগণের সমাধির উপর অস্পৃশ্য জন্তুগণের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত করিয়া, তাঁহারা মামুদ, আলাউদ্দীন ও আরঙ্গজেবের ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতে লাগিলেন। মলহররাও এই সকল অভিযানের নেতা ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ভারতভূমির তখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে হিন্দুজাতির মধ্যে কেহ উদ্‌যোগী পুরুষ থাকিলে, ভারত লক্ষ্মী তাঁহারই অঙ্ক-শায়িনী হইবেন। সেই জন্য দাক্ষিণাত্যের ন্যায় আর্য্যা-বর্ত্তেও হিন্দুজাতির, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র জাতির প্রাধান্য সংস্থাপনের জন্য, তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগি-লেন। তাঁহার উদ্দেশ্যও কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইল। অযোধ্যা হইতে সিন্ধু নদের উপকূল, এবং রাজপুতানার পর্ব্বতমালা হইতে কুমায়ুনের পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ, মহারাষ্ট্রগণের আক্রমণে উপদ্রুত হইয়া পড়িল।

যতদিন সম্ভব, মোগল সম্রাটগণ, মহারাষ্ট্রগণের অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদিগকে দমন করা আর তাঁহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে, তখন তাঁহারা নিজেই তাঁহাদিগের সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। উৎকোচ ও রাজ্যাংশ প্রদানে বশীভূত করিয়া, তাঁহারা মহারাষ্ট্রদিগকেই তাঁহাদিগের অন্তঃশত্রু-গণের দমনে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। দিল্লীশ্বরের এইরূপ আমন্ত্রণে মলহররাও একবার রোহিলাগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন। বীরত্বের ন্যায় সমরকৌশলও তখন মহারাষ্ট্র-সমাজে তুল্য-সমাদৃত হইত। মলহররাও রোহিলা-দিগের সহিত যুদ্ধে এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। আপনার সৈনিকদিগকে রোহিলাগণের অপেক্ষা সংখ্যায় ন্যূন দেখিয়া, তিনি তাহাদিগকে রাত্রিযোগে আক্র-মণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। গভীর রাত্রিতে তিনি সসৈন্যে শত্রুশিবিরের একাংশ আক্রমণ করিলেন এবং বহুসংখ্যক বৃষ ও মহিষের শৃঙ্গে আলোকবর্ত্তি বন্ধন করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে শিবিরের অপরাংশে প্রেরণ করিলেন। শত্রু-গণ, অন্ধকারে আক্রান্ত হইয়া, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল আলোক-মালায় এবং পশু-পালদিগের চীৎকারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, তাহারা বিবেচনা করিল যে, দুইদিক হইতে দুইটী স্বতন্ত্র সৈন্যদল

তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তখন তাহারা শ্রেণীভঙ্গ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।* মলহর-রাও এইরূপে বিজয়লাভ করিলেন এবং শত্রু-শিবির তাঁহার অধিকৃত হইল। দিল্লীশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে চান্দোর প্রদেশের রাজস্বের অধিকার প্রদান করিলেন। কিন্তু মলহররাও, কার্য্যতঃ স্বাধীন হইলেও, তখনও আপনাকে পেশোয়ার সেনাপতি মাত্র বিবেচনা করিতেন; সুতরাং প্রভুর অজ্ঞাতে ও অনভিমতে তিনি এইরূপ পুরস্কার গ্রহণ করিলেন না। চান্দোর প্রদেশের "দেশমুখ" এই উপাধি মাত্র গ্রহণ করিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন। হোলকার বংশে এই দেশ-মুখ-পদবী অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

মোগল-সাম্রাজ্য এই সময় একদিকে যেমন অন্তর্ব্বিদ্রোহে হীনবল হইয়া আসিয়াছিল, বহিঃশত্রুগণের আক্রমণেও অপরদিকে তেমনই উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। ইতি-হাস প্রসিদ্ধ আহম্মদ সা আব্দালী এই সময় আপনার দুর্দ্দান্ত আফ্‌গান সৈনিকগণের সহিত, পঞ্জাব লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব বিধ্বস্ত করিয়া, মহারাষ্ট্রগণই তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের অধীশ্বর

* কার্থেজের ইতিহাসেও পাঠক অবিকল এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। বীরবর হানিবালও একবার এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

হইয়াছিলেন। সুতরাং এই অভিনব শক্রর গতিরোধ করিবার জন্য মহারাষ্ট্রগণকেই প্রস্তুত হইতে হইল। থানেশ্বর ক্ষেত্রের ন্যায় পাণিপথ ক্ষেত্রেও আর একবার ভারতের ভাগ্য পরীক্ষিত হইল; এবং বিজয়লক্ষ্মী পূর্ব্বের ন্যায় এবারও মুসলমানের অঙ্কশায়িনী হইলেন। পাণিপথ যুদ্ধে মহারাষ্ট্রগণ পরাজিত না হইলে, হিন্দুস্থান আবার হিন্দুরই হইত। কিন্তু বিধাতার তাহা ইচ্ছা ছিল না; বিপুল পরাক্রম ও শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াও, মহারাষ্ট্রগণ বিজয় লাভ করিতে পারিলেন না। হিন্দুর যে গৃহবিবাদ, ভারতে প্রথম মুসলমান-রাজ্য সংস্থাপনের কারণ হইয়াছিল, এখানেও তাহা হিন্দুর সর্ব্বনাশের কারণ হইল। মহারাষ্ট্র সেনাপতি সদাশিবরাও-ভাওয়ের দুর্জ্জয় আত্মাভিমান মহারাষ্ট্রগণের সর্ব্বনাশের কারণ হইল। মলহররাও, অন্যান্য মহারাষ্ট্র বীরগণের ন্যায়, স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরব রক্ষার জন্য, সসৈন্য পাণিপথ ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। গর্ব্বিত সদাশিব তাঁহার সহিত উপযুক্ত ব্যবহার করিতেন না; বরং মলহররাও, তাঁহাদিগের বংশের ভৃত্য বলিয়া, অনেক সময় তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন। একবার মলহররাও তাঁহাকে কোন সৎপরামর্শ দান করিলে, তিনি সভাস্থলেই সকলের সমক্ষে তাঁহাকে বলিলেন, "ছাগপালের পরামর্শ শুনিতে

কে চায়।” বলা বাহুল্য যে, মলহররাও সর্ব্বজন সমক্ষে এইরূপ অপমানিত হইয়া, দারুণ বেদনা প্রাপ্ত হইলেন। যে উৎসাহের এবং স্ফূর্ত্তির সহিত তিনি রণক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন তাহা অন্তর্হিত হইল। মহারাষ্ট্র জাতির দক্ষিণ। বাহু এইরূপে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত আঘাতে বলহীন হইয়া পড়িল। যুদ্ধে এত অধিক মহারাষ্ট্র সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল যে, মহারাষ্ট্র দেশে এমন পরিবার অতি অল্পই ছিল, যাহাকে এই যুদ্ধে হত বা আহত কাহারও জন্য অশ্রুপাত করিতে হয় নাই। একমাত্র মলহর রাওই, কেবল, আপনার সৈন্য সামন্তগণের সহিত সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। পাণিপথ যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্র চক্রের অন্যান্য সকলে হীনবল হইয়া পড়াতে, মলহররাও স্বজাতীয়গণের নেতা স্বরূপ হইলেন। বহুদিন রাজত্ব ভোগের পর পূর্ণ বয়সে এবং পূর্ণ গৌরবে তাঁহার মৃত্যু হইল। দোষ গুণ সমস্ত লইয়া বিবেচনা করিলে, তাঁহার ন্যায় পুরুষ মহারাষ্ট্র জাতির মধ্যে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রক্তপাত এবং যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে যাঁহাদিগকে নিজের পথ পরিষ্কৃত করিতে হয়, তাঁহাদিগের চরিত্রে গুণের ন্যায় দোষও যথেষ্ট থাকে; মলহররাওয়েরও ছিল। শিবাজী যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই

তখন মহারাষ্ট্রীয়গণের আদর্শ স্বরূপ ছিল। স্বদেশ-বাৎসল্য ও স্বধর্ম্মানুরাগ, শৌর্য্য, ভোগসুখ-বিতৃষ্ণা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের সঙ্গে, কপটতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দোষও মহারাষ্ট্রীয় বীরগণের প্রকৃতিতে লক্ষিত হইত। শত্রুর উপর বিজয় লাভ করিবার জন্য, সদসৎ যে কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারা যায়, এইরূপ সংস্কার তাঁহাদিগের অস্থিমজ্জার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং মলহররাওয়ের অনেক কার্য্য ন্যায়বিগর্হিত হইত। কিন্তু তাঁহার এই একটী প্রধান গুণ ছিল যে, তিনি অকারণ কাহারও উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন না। পরাজিত শত্রুকে অনেক সময় তিনি সদ্ব্যবহার দ্বারা বশীভূত করিতেন। পশুপালের অবস্থা হইতে তিনি যে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু দানশীলতাই তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান গুণ* ছিল। আত্মীয় স্বজনের এমন কি সমগ্র মহা-রাষ্ট্র জাতির প্রতি তাঁহার করুণা নিরন্তর প্রবাহিত হইত। তাঁহার পুত্রবধূ রাণী অহল্যা, তাঁহার সম্পত্তির ন্যায়,

---

"The principal virtue of Mulhar Row was his generousity. * * * To his relations, and indeed to all Marhrattas, he was uncommonly kind." Malcolm's *Central India and Malwa*". Page 128-29.

তাঁহার এই গুণেরই প্রধান অধিকারিণী হইয়াছিলেন। রাণী অহল্যা যে বংশের বধূ, এবং তিনি যে সমাজে ও যে কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত হইয়াছে; এইবার আমরা তাঁহার জীবন-চরিত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথম অধ্যায়।

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে মালব দেশের অন্তর্গত একটি সামান্য পল্লীতে অহল্যাবাই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সে সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতৃবংশ সিন্ধিয়া নামে পরিচিত, এবং তাহা সুপ্রসিদ্ধ সিন্ধিয়া রাজবংশের সহিত স্বসম্প-র্কীয় ছিল। অহল্যাবাইয়ের পিতা মাতার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, এবং বাল্যকালে কিরূপ শিক্ষার ও সহ-বাসের গুণে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়াছিল, তাহাও অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার শৈশ-বের ঘটনাবলী সম্পূর্ণরূপেই সাধারণের অপরিজ্ঞাত। মলহর রাও হুলকারের একমাত্র পুত্র কুন্দরাওয়ের

সহিত অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। কুন্দ রাও পিতার জীবদ্দশায় ভরতপুরের নিকটবর্ত্তী কুম্ভীর নামক কোন দুর্গ অবরোধের সময় প্রাণত্যাগ করেন। তখন অহল্যার বয়স কেবল উনবিংশতি বৎসর মাত্র। সেই সময় তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার বৈধব্যের একাদশ বৎসর পরে, অহল্যার ত্রিংশৎ বৎসর বয়সের সময়, তাঁহার শ্বশুর মলহর রাও পরলোক গমন করেন।

মলহর রাওএর মৃত্যুর পর হইতেই অহল্যাবাইয়ের জীবনের ঘটনাবলী সাধারণের পরিচিত হইয়াছে। যতদিন তাঁহার শ্বশুর জীবিত ছিলেন, ততদিন রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। সাধারণ হিন্দুকুলবধূর ন্যায়, পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া, তাঁহার সময় শান্তিতে অতিবাহিত হইত। কিন্তু মলহর রাওয়ের মৃত্যুর সঙ্গেই রাজ্যের সমস্ত ভার তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হয়, এবং সেই সময় হইতেই তিনি লোক-চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূতা হন। মলহর রাও কিরূপ অব-স্থায় রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আমরা উপ-ক্রমণিকায় তাহা উল্লেখ করিয়াছি। বাহুবলে যাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া, তিনি নিজের গৌরবের প্রতিষ্ঠা করিয়া-

ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার উপর জাতক্রোধ ছিলেন, এবং মলহর রাওয়ের মৃত্যুর পর ইহার প্রতিবিধান করিবেন, মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং কুলবধূ অহল্যাকে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য শত্রু-মণ্ডলীর মধ্যেই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

বিপদ এবং সঙ্কটই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরীক্ষা ক্ষেত্র। অহল্যা বাই যে কিরূপ মনস্বিনী মহিলা ছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে, তাঁহার সাংসারিক এবং রাজনৈতিক, সকল প্রকার বিপদের ও দুর্ঘটনার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা প্রথমে তাঁহার সাংসারিক বিপদের কথা বলিব। ভিখারিণীই হউন,আর রাজরাণীই হউন, স্বামিই রমণীর একমাত্র অবলম্বন। ঊনবিংশ বৎসর বয়সে অহল্যা স্বামি-বিরহিতা হইয়াছিলেন। একমাত্র আশ্রয়স্থল শ্বশুরও তাহার পর পরলোক গমন করিলেন; সুতরাং, রাজ-পদের অধিকারিণী হইলেও, অহল্যাকে এই সকল বিপৎপাতে নিদারুণ মনোবেদনা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার অপেক্ষা অহল্যার আরও একটী গুরুতর মানসিক অশান্তির কারণ ছিল। তাঁহার পুত্র, জননীর শান্তির স্থল না হইয়া, বরং, তাঁহার হৃদয়লগ্ন কণ্টক স্বরূপ হইয়াছিলেন। পৃথিবীর মহাপুরুষগণের জীবনচরিত

আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে সাংসারিক সুখে সুখী ছিলেন না। পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, কাহারও না কাহারও জন্ম তাঁহাদিগকে অশ্রুপাত করিতে করিতে জীবন অতিবাহত করিতে হইয়াছে। অহল্যার জীবনও ইহার অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল। অহল্যার পুত্র মল্ল রাও অতি দুর্ব্বৃত্ত ও অসৎপ্রকৃতি ছিলেন। নিজের অসদাচারের ফলে তরুণ বয়সেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়; কিন্তু যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার ব্যবহারে অহল্যাকে দিবারাত্রি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইত। বাল্যকাল হইতে মল্ল রাওয়ের মস্তিষ্ক বিকৃত ও চিত্ত অব্যবস্থিত ছিল। অহল্যা আশা করিয়াছিলেন যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এবং রাজত্বের ভার স্কন্ধে পড়িলে মল্ল রাওয়ের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু তাঁহার আশা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল। মলহর রাওয়ের মৃত্যুর পর, মল্ল রাও যদিও পিতামহের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাবের বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন ঘটিল না। উন্মাদোচিত নৃশংস ব্যবহারে তিনি জননীকে ব্যথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। বৈধব্যের পর হইতে অহল্যা আপনার জীবন দেবব্রাহ্মণসেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মল্ল রাও, জননীর কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া, নানা-

প্রকারে তাঁহার ব্রতে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন। অহল্যা ব্রাহ্মণদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, মল্ল রাও তাঁহাদিগকে বিষ দৃষ্টিতে দেখিতেন; এবং যে কোন উপায়েই হউক, তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে চেষ্টা করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে অপমানিত করিবার এবং যন্ত্রণা দিবার জন্য, তিনি নিত্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেন। কখনও পরিধেয় বস্ত্র ও পাদুকার অভ্যন্তরে গোপনে তীক্ষ্ণবিষ বৃশ্চিক রাখিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে পরিধান করিবার জন্য দান করিতেন; কখনও বা ধাতুকলস রৌপ্যমুদ্রায় পূর্ণ করিয়া এবং তাহার ভিতর বিষধর সর্প রাখিয়া দিয়া, দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদিগকে ইচ্ছামত অর্থ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা দিতেন। ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসিগণ তন্মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিলে নির্ব্বোধ মল্লরাওয়ের আর আনন্দের অবধি থাকিত না।

অহল্যার করুণ হৃদয় এই সকল দৃশ্যে বিদীর্ণ হইত। কি পাপে বিধাতা এই নরপিশাচকে তাঁহার গর্ভে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তিনি কেবল দিবারাত্রি অশ্রুপাত করিতেন এবং উৎপীড়িতদিগকে উপযুক্ত পুরস্কারাদি দিয়া, সান্ত্বনা দান করিবার চেষ্টা করিতেন। নির্ব্বোধ মল্লরাও, এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়া,

অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সিংহাসনে আরোহণের নয় মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। একবার তিনি রাজপ্রাসাদস্থ একজন শিল্পীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, আক্রোশবশতঃ, তাহার প্রাণবধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি জানিতে পারিলেন, যে সে ব্যক্তি নিরপরাধ, বিনা দোষেই তাহার প্রাণবধ করা হইয়াছে। তখন মল্লরাওয়ের মানসিক শান্তি অন্তর্হিত হইল। দারুণ অনুতাপে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং রোগ-শয্যায় তাঁহার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। লোকে বলিত যে, হতব্যক্তি প্রেতসিদ্ধ ছিল এবং সে মল্লরাওকে, বিনাপরাধে, তাহাকে বধ করিতে, নিষেধ করিয়াছিল। মল্লরাও, তাহার নিষেধ না শুনিয়াই, তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। পীড়িতাবস্থায় এক্ষণে মল্লরাওয়ের সর্ব্বদাই মনে হইত, যে সেই নিহত শিল্পীর প্রেতাত্মা আসিয়া, তাঁহার প্রাণ নাশের উদ্যোগ করিতেছে। প্রেতযোনির অস্তিত্বে পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিরই স্বল্পাধিক বিশ্বাস আছে;—অহল্যারও ছিল। তিনি আহার নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া, পুত্রের রোগশয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিতেন এবং পুত্রের দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য, প্রেতাত্মার নিকট অশ্রুপূর্ণ নয়নে

প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দিন দিনই মল্লরাওয়ের পীড়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রোগের যন্ত্রণায় তিনি যে সকল প্রলাপ বলিতেন, তাহার অধিকাংশই সেই মৃত শিল্পীর হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং অন্যান্য সকলের ন্যায় অহল্যার নিজেরও মনে পুত্রের দেহে প্রেতাত্মার আবির্ভাব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি, প্রেতাত্মার অধিষ্ঠানের জন্য, একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিলেন; এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের জন্য, জাইগীর দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু প্রেতাত্মা কিছুতেই পরিতুষ্ট হইল না। অধিকাংশ সময়ই মল্লরাওয়ের মুখ হইতে কেবল এই মাত্র কথা নির্গত হইত, "সে যখন নিরপরাধে আমায় হত্যা করিয়াছে, তাহার প্রাণ না লইয়া আমি সন্তুষ্ট হইব না।" অহল্যা ক্রমশঃ পুত্রের জীবন সম্বন্ধে নিরাশ্বাস হইলেন; এবং হতভাগ্য মল্লরাও কিছু দিন যন্ত্রণা ভোগের পর, সেই পীড়াতেই প্রাণত্যাগ করিলেন। *

* মধ্যভারত ও মালবদেশের ইতিবৃত্ত-লেখক, সার জন ম্যালকম লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ বলেন, যে পুত্রের দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া, অহল্যা নিজেই যাহাতে মল্লরাওয়ের সত্বর মৃত্যু হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে এই জনশ্রুতি যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাহার যথেষ্ট

অহল্যা, তাঁহার ক্রুর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্বার্থপরায়ণ গঙ্গাধর, আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, তাৎকালিক মহারাষ্ট্র চক্রের অন্যতর নেতা, ও পেশোয়ার পিতৃব্য রাঘবদাদাকে উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অর্থলোলুপ রাঘবও, ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া, গঙ্গাধরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হওয়াতে, গঙ্গাধরের সংস্কার জন্মিয়াছিল, যে অহল্যা আর তাঁহার প্রস্তাবের বিপক্ষতাচরণ করিতে সাহসী হইবেন না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আপনার ভ্রম সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। অহল্যা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে জানাইলেন, যে শ্বশুর এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তিনিই তাঁহাদিগের পরিত্যক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারিণী। দত্তক-পুত্র-গ্রহণ ইত্যাদি যে কোন অধিকারই হউক, তাহা কেবল তাঁহারই আছে। রাঘব দাদার বা অন্য কোন মহারাষ্ট্র সামন্তের সে সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবার বিন্দুমাত্রও অধিকার নাই। গঙ্গাধর রাঘবকে উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক নিজের পক্ষে আনিতে চাহিয়াছেন শুনিয়া, তিনি গঙ্গাধরকে অতি

কঠোর ভর্ৎসনা করিলেন; এবং যে সমস্ত মহারাষ্ট্র-সামন্ত সেই সময় মালবদেশে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সকলেরই মত জিজ্ঞাসা করিলেন। রাঘব দাদা এবং গঙ্গাধর-যশোবন্ত যে অন্যায়পূর্ব্বক অহল্যাকে তাঁহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছিলেন, তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা সকলেই অহল্যার পক্ষ সমর্থনের জন্য স্বীকৃত হইলেন। গঙ্গাধর, অহল্যার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, রাঘব দাদাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পতিপুত্রহীনা একজন বিধবা যে তাঁহার আদেশের অন্যথাচরণ করিবে, রাঘব তাহা কখন স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। বিশেষতঃ অহল্যা তাঁহাদিগের বংশের পূর্ব্বতন ভৃত্য মলহর রাওয়ের পুত্রবধূ বলিয়া, রাঘবের একটু অহঙ্কারও ছিল; সুতরাং অহল্যার ঔদ্ধত্য দমন করা রাঘব দাদার প্রতিপত্তি রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইল। তিনি সাড়ম্বরে সমরসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অহল্যা যখন শুনিলেন যে, রাঘব তাঁহার সহিত সত্যই যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন, তখন তিনিও অকুতোভয়ে যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। গঙ্গাধরের ব্যবহারে অনেকেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, সুতরাং অহল্যা

সকলেরই সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলেন। হুল্‌কারের সৈন্যগণ মহা উৎসাহে ও আনন্দে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। অহল্যা, স্বয়ং তাহাদিগের নেত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া, যুদ্ধ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। বাণ-পূর্ণ তূণীর ও ধনু সঙ্গে লইয়া তিনি হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও বীরাঙ্গনার ন্যায় সাহস দর্শন করিয়া, শত্রু মিত্র সকলেই বিস্মিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে বিনা রক্তপাতে বিবাদের মীমাংসা হইল। গঙ্গাধর ও রাঘব যে অন্যায়-পূর্ব্বক অহল্যার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। সুতরাং মধুজি সিন্ধিয়া, জম্বুজি ভোঁসলা প্রভৃতি মহারাষ্ট্র বীরগণ রাঘবের পক্ষ অবলম্বন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের আয়োজনের সঙ্গে অহল্যা, রাঘবের ভ্রাতুষ্পুত্র, মধুরাও পেশোয়াকে রাঘবের ব্যবহার জ্ঞাপন করিয়া, এক পত্র লিখিয়াছিলেন; এবং রাঘবকেও বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "আপনি বীরপুরুষ, আমি রমণী; আমার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিলে আপনার গৌরব হইবে না, কিন্তু পরাজিত হইলে অগৌরব হইবে। এ যুদ্ধে আপনার লাভ কি?" অহল্যার সমরসজ্জা ও নির্ভীকতা দেখিয়া, রাঘব এ কথার অর্থ বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়া-

ছিলেন। সেই জন্য যুদ্ধে আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ ও অনুরাগ ছিল না। এদিকে মধুরাও পেশোয়াও, অহল্যার পত্রে সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া, পিতৃব্য রাঘবকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিতে রাঘবের সাহস হইল না। তিনি যুদ্ধে নিরস্ত হইলেন। নরশোণিতপাত না করিয়া, এইরূপে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হইল।

যুদ্ধান্তে অহল্যা তুকাজী হুল্‌কার নামক মলহর রাওয়ের স্বসম্পর্কীয় জনৈক বীরপুরুষকে আপনার সেনাপতি ও কার্য্যাধ্যক্ষ রূপে গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাধর ও রাঘ আপনাদিগের ক্রূর অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য, সাধারণকে বুঝাইয়াছিলেন, যে অহল্যা যতই বুদ্ধিমতী ও কার্য্যপারদর্শিনী হউন, তথাপি তিনি রমণী। কোন সক্ষম পুরুষের হস্তে কার্য্যভার না থাকিলে, চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে মলহররাওয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষা করা কঠিন হইবে। সেই জন্যই তাঁহারা অহল্যার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। অহল্যা নিজেও বুঝিতেন, যে বিষয়কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইলেও, তিনি কুলবধূ; নারীজনোচিত কার্য্যই তাঁহার দ্বারা অধিক-

তর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং তিনিও কোন পুরুষ সহায়তাকারীর সাহায্য গ্রহণে অনভিলাষিণী ছিলেন না। তবে রাঘব অথবা গঙ্গাধর-যশোবন্ত, যে তাঁহার ন্যায্য অধিকারে অসঙ্গত হস্তক্ষেপ করিবেন, ইহাতেই তাঁহার আপত্তি ছিল, এবং সেই জন্যই তিনি তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে কাহারও আর কোন আপত্তির কারণ রহিল না। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি কঠোরতর কার্য্যসমূহের ভার তুকাজীর হস্তে সমর্পণ করিয়া, অপেক্ষাকৃত কোমল কার্য্যসমূহ অহল্যা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। একদিকে তাঁহার হৃদয় যেমন কোমল ছিল, তাঁহার সাংসারিক বুদ্ধিও তেমনই প্রখর ছিল। অভিমানী রাঘবকে নিজের প্রাসাদে আহ্বান করিয়া, তিনি এরূপ সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, যে তাঁহার ব্যবহারে রাঘবের তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব দূরীভূত হইল। তাঁহার শ্বশুরের পুরাতন ভৃত্য বলিয়া, অহল্যা, গঙ্গাধরেরও অপরাধ ক্ষমা পূর্ব্বক, তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। পাছে তাঁহার নিজের মনোনীত কার্য্যাধ্যক্ষ তুকাজীকে সাধারণে সম্মান না করেন, সেই ভয়ে তিনি তাঁহাকে রাঘবের সহিত মহারাষ্ট্র

রাজধানী পুনায় পেশোয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন। মোগল বাদসাহগণের প্রভুত্ব হ্রাস হইলেও, স্থানীয় শাসন কর্ত্তাগণ যেমন তাঁহাকেই ভারতের সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সিন্ধিয়া, হুলকার, ভোঁসলা প্রভৃতি মহারাষ্ট্র সামন্তগণ, কার্য্যতঃ স্বাধীন হইলেও, তেমনই পেশোয়াকেই মহারাষ্ট্রচক্রের নেতা বলিয়া সম্মান করিতেন। তিনি যখন তুকাজীর নিয়োগে অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ ও নিযুক্তিপত্র প্রদান করিলেন, তখন অপর সকলেও তাঁহাকে সম্মান করিতে বাধ্য হইলেন। প্রাণিহত্যা না করিয়া রাজ্ঞী অহল্যার অভিলাষ এইরূপে সুসম্পন্ন হইল।

যে অবস্থায় অহল্যাকে এই সকল ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা সম্বন্ধে আমাদিগের সমধিক শ্রদ্ধা জন্মে। একমাত্র পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুতে যখন তিনি ম্রিয়মাণা হইয়াছিলেন, তখনই তাঁহাকে এই সকল রাজনৈতিক ঘূর্ণবায়ুর মধ্যে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অপর পুত্র ছিল না; তাঁহার দুহিতা শাস্ত্রানুসারে পিতামহের রাজ্যের অধিকারিণী ছিলেন না। তিনি নিজে রাজ্ঞী হইয়াও তপস্বিনীর ন্যায় কঠোর নিয়মে দিনপাত করিতেন;

সুতরাং কোন কারণে সাম্রাজ্যের আকর্ষণ তাঁহার বিন্দু মাত্রও ছিল না। গঙ্গাধর-যশোবন্ত তাঁহার যেরূপ প্রচুর বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে বিনা উদ্বেগে সসম্মানে তাঁহার জীবন অবিতাহিত হইতে পারিত। তিনি যেরূপ কোমলস্বভাবা ছিলেন, তাহাতে বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া, নির্ব্বিবাদে বৃত্তিভোগ ও ধর্ম্মাচরণ করাই তাঁহার প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কেবল ন্যায় ও সত্যের সম্মান রক্ষার জন্যই, তিনি অসদাচারিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। একদিকে নারীসুলভ কোমলতা ও অপরদিকে পুরুষোচিত কাঠিন্য, তাঁহার প্রকৃতিতে যেরূপ সুন্দররূপে সম্মিলিত দেখিতে পাওয়া যায়, অতি অল্প ঐতিহাসিক রমণীর মধ্যেই সেরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার এক একটী কার্য্য আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার রাজশক্তি কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত হইয়াছেন, সে শক্তি তিনি কিরূপে পরিচালিত করিয়াছিলেন, এইবার আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কিরূপ অবস্থায় এবং কিরূপ ভাবে অহল্যা বাই রাজ্য-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। যতক্ষণ প্রয়োজন, পুরুষোচিত সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করিয়া, তিনি আপনার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখী হন নাই; কিন্তু তিনি ভোগ-সুখের বা প্রভুত্ব প্রদর্শনের জন্য রাজ্যাভিলাষিণী ছিলেন না। রাজ্যের কল্যাণের জন্য একজন পুরুষ সহযোগীর আবশ্যক বুঝিয়া, তিনি তুকাজার হস্তে রাজ্যের পুরুষোচিত কার্য্যসমূহের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক, স্বয়ং নারীজনোচিত লঘুভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুকাজী সাহসী, স্থিরপ্রকৃতি এবং কর্ম্ম-ক্ষম পুরুষ ছিলেন। অহল্যার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং সম্মান ছিল। অহল্যাও তাঁহাকে আন্তরিক বিশ্বাস

করিতেন। তুকাজী যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজ্যের আভ্যন্তরিক শান্তি-সংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন; অহল্যা তাঁহার সহায়তায় নিশ্চিন্ত হইয়া, প্রজাপুঞ্জের কল্যাণসাধনে ও ধর্ম্মানুশীলনে নিযুক্ত থাকিতেন। রাজশক্তির এরূপ বিভাগ দ্বারা যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মিবার সম্ভাবনা, অহল্যা এবং তুকাজীর মধ্যে সেরূপ কোন ভাব উৎপন্ন হয় নাই। অহল্যার প্রভুত্বের প্রতি লালসা ছিল না সুতরাং তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে, তুকাজীর হস্তে, শাসনশক্তি সমর্পণ করিয়াছিলেন। তুকাজীও জানিতেন, যে অহল্যার ন্যায় রাজ্ঞীর অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে গৌরবের বিষয়। সেই জন্য তিনিও সকল বিষয়ে সাধ্যানুসারে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। অহল্যার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তুকাজী অহল্যাকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন; এবং অহল্যার মৃত্যুর পর তিনিই মলহররাওয়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তুকাজীর বংশধরগণই এক্ষণে ইন্দোরে রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহাদিগের আদিপুরুষ যে অহল্যার মনোমত ও প্রীতিভাজন ছিলেন, তাহাই এক্ষণে তাঁহারা তুকাজীর সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করেন।

রমণী হইয়াও অহল্যা যেরূপ দক্ষতা ও সুশৃঙ্খলার সহিত আপনার গুরুভার বহন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার শ্বশুর মলহর-রাও বাহুবলে হুলকার বংশের সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও শৃঙ্খলা অহল্যার সময়েই সাধিত হইয়াছিল। রাজসংসারের বিপুল সম্পত্তি অহল্যারই হস্তে সমর্পিত থাকিত। তিনি রাজ্যের আয় ব্যয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতেন; এবং তাঁহারই সুব্যবস্থার গুণে সে সময়কার দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে হুলকার-রাজ্য একটী প্রধান সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। প্রজাগণের সুখ ও শান্তি অহল্যার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার শক্তি ও সামর্থ্যে যতদূর সম্ভব, প্রজাগণের মঙ্গল সাধনে তিনি কখনও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেন না। এক্ষণে আমাদিগের দেশে যেরূপ অবরোধ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এরূপ ভাবে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না। মহারাষ্ট্র-গণ মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক ভারতের অন্যান্য জাতির ন্যায় কখনও সম্পূর্ণরূপ বিজিত হন নাই; সেইজন্য মুসলমান জাতির রাজনীতি ও সামাজিক প্রথা মহারাষ্ট্র

সমাজে প্রবেশ লাভ করে নাই। অহল্যা অবাধে প্রকাশ্ব রাজসভায় উপবিষ্ট থাকিয়া, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। রাজ্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি সমস্ত রাজ্যের ভূমির পরিমাণ করিয়া, রাজস্বসম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। অনেক রাজা এরূপ স্থলে আয় বৃদ্ধির জন্য, প্রজাগণের ভূসম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু অহল্যার প্রজাগণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে যে স্বত্ব উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ মাত্র করেন নাই। প্রজাগণের সকল প্রকার আবেদন তিনি স্বয়ং স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন। তাঁহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান এরূপ প্রবল ছিল যে, বিচারপ্রার্থীর আবেদন অতি সামান্য হইলেও, সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, তিনি কখনও কোন আজ্ঞা প্রদান করিতেন না। মধ্য ভারতের ইতিহাস-লেখক স্যার জন ম্যাকলম্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে কি জানি হুলকার বংশীয়গণের নিকট অনুসন্ধান করিলে, পাছে তাঁহারা পক্ষপাতিত্ববশতঃ অহল্যার সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রশংসা করেন, সেইজন্য আমি, যতদূর সম্ভব, নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের নিকট অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, যতই অনুসন্ধান করিয়াছি,

অহল্যার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ততই অধিক বর্দ্ধিত হই-য়াছে*। রাজকার্য্য হইতে অবসর লাভ করিয়া অহল্যা যতটুকু সময় পাইতেন, তাহা ধর্ম্মানুশীলনে ও সৎকার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যেরই মূলে প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস বর্ত্তমান ছিল। তিনি বলিতেন, "ঈশ্বর আমাকে যে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহারের জন্য আমি তাঁহার নিকট দায়ী।" অপরাধীকে দণ্ড দিতে হইলে অহল্যার কোমল হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইত। তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহাকে বলিতেন, রাজত্ব করিতে হইলে এরূপ কোমলহৃদয় হওয়া উচিত নয়; দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন ভিন্ন কোন রাজ্য রক্ষা হওয়া সম্ভব নয়। মন্ত্রিগণের কথা যে সত্য, অহল্যা নিজেও তাহা বুঝিতেন; কিন্তু স্বাভাবিক কোমলতা বশতঃ তিনি সকল সময় মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন না। কাহারও প্রাণদণ্ডের বা তাদৃশ

* * * "although inquiries have been made among all ranks and classes, nothing has been discovered to diminish the eulogiums or rather blessings, which are poured forth whenever her name is mentioned. The more, indeed, enquiry is pursued, the more admiration is excited."

Malcolm's *Central India and Malwa.* Page 145

কোন কঠোর আজ্ঞা প্রদান করিবার সময় তিনি বলিতেন, "মরণ-ধর্ম্মশীল জীব হইয়া, সেই সর্ব্বশক্তিমানের সৃষ্ট কোন প্রাণীকে বিনাশ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের একবার বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।"

সাধারণ রমণীগণ অনেক সময় বৃথা কার্য্যে ও অসার কথোপকথনে সময়াতিপাত করিয়া থাকেন; অহল্যা কখনও সেরূপ করিতেন না। অনর্থক সময়ক্ষেপ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের একটী পাণ্ডুলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিতেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, সন্ধ্যা বন্দনাদির পর, তিনি নিয়মিতরূপে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ ইত্যাদি শ্রবণ করিতেন। সেই সময়ে তাঁহার দ্বারদেশে বহু-সংখ্যক ভিক্ষুক সমাগত হইত। অহল্যা স্বহস্তে তাহা-দিগকে ভিক্ষা দিতেন এবং তাহার পর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া, স্বয়ং যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন। নিজের পানাহার সম্বন্ধে তিনি অতি নিষ্ঠাবতী ছিলেন। হুলকারবংশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে যে জাতির অন্তর্ভূত, তাহার বিধবাগণের পক্ষে মৎস্য মাংসাহার নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু

অহল্যা কখনও মৎস্য মাংস স্পর্শ করিতেন না। আহারের পর সামান্য ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, তিনি রাজ সভায় যাইয়া বসিতেন এবং সেখানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপ রাজ-কার্য্য করিতেন। অপরাহ্নে সভা ভঙ্গ হইবার পর অনূ্যন তিন ঘণ্টা কাল সায়ংসন্ধ্যা, পূজা ইত্যাদিতে অতিবাহিত হইত। তাহার পর পুনর্ব্বার রাজকার্য্য আলোচনা করিতে বসিতেন। এইরূপে দৈনিক সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তিনি শয়ন করিতেন। দেবপূজা, উপবাস এবং রাজকার্য্য, এই তিন বিষয়ে তাঁহার কখনও আলস্য বা ঔদাসীন্য ছিল না। মহারাষ্ট্র দেশে যত প্রকার উৎসব এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলিত আছে, সকল গুলিই তিনি অতি যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করিতেন। অনেকে কেবল সামাজিক রীতি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যই পূজা পাঠাদি করিয়া থাকেন; কিন্তু অহল্যা সেরূপ ছিলেন না; তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রগাঢ় ভক্তিমূলক ছিল। কেবল দেবতা বিশেষের পূজাই যে তাঁহার নিকট ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা নয়; দীন দরিদ্রের সেবা, রাজ-কার্য্য, পূর্ত্তকার্য্য, প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার নিকট ধর্ম্মানু-মোদিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। কেহ কেহ মনে

করেন, যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে যাইলে, সাংসারিক কার্য্য করা হয় না, এবং সাংসারিক কার্য্য করিতে হইলে, ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যায় না। কিন্তু এরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সংসারে থাকিলে যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনেক বিঘ্ন হয়, তাহা সত্য, কিন্তু যিনি সাংসারিক বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ লিপ্ত হইয়াও "ভগবৎ পদারবিন্দ" বিস্মৃত না হন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক, এবং সংসাররূপ সংগ্রাম ক্ষেত্রে তিনিই বিজয়ী বীর। সংসারে থাকিয়াও কিরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, অহল্যার জীবনে আমরা তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ব্রত, পূজা, উপবাস প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কোন রূপ অনুষ্ঠানেই তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল না, অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিষয়ালোচনায়ও তিনি পরাঙ্মুখী হইতেন না। ভোগসুখের বাসনা না রাখিয়া অহল্যা যেরূপ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল।

রাজোচিত কর্ত্তব্য প্রতিপালন করা সকল সময়েই কঠিন। সময় বিশেষে তাহা আরও সুকঠিন হইয়া থাকে। অহল্যার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে সেই জন্য যে সময়ে তিনি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক। এখন ভারতবর্ষ যেরূপ

শান্তি-সুখ ভোগ করিতেছে, অহল্যার সময়ে সেরূপ অবস্থা ছিল না। ইংরাজ শাসনের ভয়ে দেশীয় রাজন্য-বর্গ, এক্ষণে আর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে সাহস করেন না। হিমজীর্ণ ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কিন্তু অহল্যার সময়ে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ মধ্য ভারতের, অবস্থা অন্যরূপ ছিল। আফ্রিকার নিরন্তরবিবদমান-হিংস্র-জন্তুসমাকুল অরণ্যানীর সহিত তাহার তুলনা করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। একদিকে লুণ্ঠনকারী দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রগণ, অপর দিকে জাঠ, রোহিলা, পিণ্ডারী প্রভৃতি নানা জাতীয় এবং নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ সৈনিক দস্যুগণের উপদ্রবে মধ্য ভারত তখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। এরূপ অবস্থায় অহল্যা যে আপনার রাজ্যে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অতীব গৌরবের বিষয়। তাঁহার শাসনের এমনই গুণ এবং তাঁহার নামের এমনই প্রভাব ছিল, যে তাঁহার প্রতিবাসী সমরলোলুপ রাজন্য বর্গের মধ্যে কেহ কখনও তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই। একবার মাত্র উদয়পুরের রাণা, কয়েক সপ্তাহের জন্য, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অহল্যার

প্রেরিত সেনাপতির নিকট পরাজিত হইয়া, তিনি সত্বরই সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার সভায় অন্যান্য রাজগণের প্রেরিত যে সকল দূত অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে তাঁহার মহত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অহল্যারও প্রেরিত রাজদূত পুনা, হায়দ্রাবাদ, শ্রীরঙ্গপত্তন, নাগপুর, কলিকাতা প্রভৃতি সে সময়কার সমস্ত প্রধান প্রধান রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অহল্যার রাজ্যকালে যুদ্ধ বিগ্রহাদির ভার তুকাজীর হস্তে সমর্পিত ছিল, সুতরাং তুকাজী যে সকল যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অহল্যার শাসনকাল যুদ্ধবিগ্রহাদির জন্য প্রসিদ্ধ নহে; প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়াছে। অধীনস্থ প্রদেশসমূহ শাসনের জন্য তিনি স্বল্প মাত্রই সৈন্য রাখিতেন, কিন্তু তাঁহার এমনই সুব্যবস্থা ছিল, যে সেই স্বল্পমাত্র সৈন্যেরই সাহায্যে তিনি তাদৃশ সঙ্কট কালেও স্বরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ "ভীম" এবং "কান্ত" এই উভয় গুণের সম্মিলনকে প্রকৃত রাজলক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অহল্যার চরিত্রে ইহাও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। সুশীল এবং শান্ত-স্বভাব প্রজাদিগকে তিনি সস্নেহ ব্যবহারে পরিতৃপ্ত করিতেন; কিন্তু উগ্রপ্রকৃতি এবং অবাধ্য প্রজাদিগকে কঠোর দণ্ডদানেও তিনি পরাঙ্মুখী ছিলেন না। প্রজাগণের ন্যায় আশ্রিত জনেরও প্রতি তিনি প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত কঠোরতা বা কোমলতা অবলম্বন করিতেন। উগ্র এবং চপলপ্রকৃতি প্রভুর নিকট কার্য্য করা অপেক্ষা ভৃত্যের পক্ষে অধিকতর কষ্টকর আর কিছুই নাই। কিন্তু অহল্যা তাঁহার অনুজীবিগণের প্রতি এরূপ স্নেহবতী ছিলেন যে, তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে কখনও মন্ত্রী পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের মধ্যেও ক্বচিৎ কখনও কাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল।

অহল্যার সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বে ইন্দোর একটী সামান্য পল্লী মাত্র ছিল। তাঁহারই সময়ে ইহা সমৃদ্ধিশালিনী নগরীতে পরিণত হয়। তাঁহার সুশাসন ও সদ্ব্যবহার-গুণে আকৃষ্ট হইয়া, দেশ দেশান্তর হইতে বণিকগণ, সেখানে আসিয়া, বাস করিতে আরম্ভ করেন। নগরবাসিগণের উপর কেহ কোন রূপ অত্যাচার করিলে, তিনি যতই উচ্চপদস্থ হউন না, অহল্যা তাঁহাকে কখনও

ক্ষমা করিতেন না। একবার তুকাজী ইন্দোরের সান্নিধ্যে অবস্থানকালে শুনিতে পাইলেন, যে সেখানকার কোন ধনী বণিক নিঃসন্তান পরলোক গমন করিয়াছেন। লোকের প্ররোচনায় এবং প্রচলিত রাজ নিয়মের অনুসারে, তিনি পরলোকগত বণিকের সম্পত্তি অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। অহল্যা তখন ইন্দোরে ছিলেন না। তিনি মিসির নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বণিক-পত্নী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। অহল্যা সবিশেষ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন এবং তুকাজীকে এরূপ উৎপীড়ন হইতে নিরস্ত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। অহল্যার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিতে তুকাজীর সাহস হইল না। বণিক-পত্নীর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল এবং ইন্দোরবাসীমাত্রই, এইরূপ উদারতার জন্য, অহল্যাকে শত মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হুলকার-বংশের আশ্রিত সামন্ত বর্গেরও সহিত অহল্যা যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বে ইহাঁদিগের সহিত রাজস্ব সম্বন্ধে কোনওরূপ সুব্যবস্থা ছিল না। যখন যেরূপ ইচ্ছা, উভয়পক্ষ, সুবিধা অনুসারে,

সেইরূপ আদান প্রদান করিতেন। তাহাতে উভয় পক্ষেরই বিশেষ অসুবিধা হইত। অহল্যা তাঁহাদিগের সহিত পরিতোষ-জনক বন্দোবস্ত করিলেন। রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং শান্তি বিস্তারের জন্য, তিনি কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে নিরস্ত হইতেন না। বণিক, কৃষক এবং কুশীদোপজীবীদিগকে সমৃদ্ধিমান দেখিলে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইত। তখন অহল্যার প্রতিবাসিগণের মধ্যে এমন অনেক দুরাচার নরপতি ছিলেন, যে তাঁহারা আশ্রিত প্রজাবর্গের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। পাছে রাজা জানিতে পারিয়া লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান, এই ভয়ে অনেকের প্রজাবর্গ আপনাদিগের ক্লেশার্জ্জিত অর্থ গোপন রাখিতে বাধ্য হইতেন, স্বেচ্ছানুরূপ ব্যয় এবং উপভোগে সাহস করিতেন না। অনেক রাজার রাজ্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ, শিবিকারোহণ প্রভৃতি কার্য্য প্রজার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। অহল্যা এই সময় তাঁহার প্রজাবর্গের সঙ্গে মাতার ন্যায় সস্নেহ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার কোন প্রজা নিজের চেষ্টায় এবং পরিশ্রমে উন্নতিলাভ করিয়াছে শুনিলে তিনি তাহার প্রতি দ্বিগুণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। প্রজাগণের ক্লেশার্জ্জিত অর্থে লালসা

প্রকাশ করা দূরে থাকুক, স্বেচ্ছাক্রমে কেহ দান করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। একবার তাঁহার রাজ্যের কোন স্থানে একজন বণিক নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। অহল্যার কোন কর্ম্মচারী বণিক-পত্নীর নিকট তিনলক্ষ মুদ্রা উৎকোচ প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন যে, উৎকোচ প্রদান না করিলে, বণিকের পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবে। বণিক-পত্নী আত্মীয়গণের পরামর্শে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উৎপীড়ক কর্ম্মচারী সেই বালককে বণিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন না। বণিক-পত্নী তখন নিরুপায়ে অহল্যার শরণাপন্না হইলেন। অহল্যা, সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিয়া, অত্যাচারী কর্ম্মচারীকে তৎক্ষণাৎ দূরীভূত করিবার আদেশ দিলেন এবং বণিক-পত্নী যে বালকটীকে দত্তক-পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে মাতৃস্নেহে ক্রোড়ে লইয়া, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং সম্মানসূচক শিবিকা প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। বণিক-পত্নী কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিতে চাহিলেন; কিন্তু অহল্যা তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাতও করিলেন না।

আর একবার তাঁহার রাজ্যের দুই ধনাঢ্য ভ্রাতা

নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। তাঁহাদিগের প্রচুর সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার পত্নী, দত্তক পুত্রাদি গ্রহণ না করিয়া, স্বামী এবং দেবরের সম্পত্তি অহল্যাকেই প্রদান করিবার জন্য, তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। এরূপ স্বেচ্ছা-প্রদত্ত দান গ্রহণ করিলে, অহল্যার পক্ষে যে কোন অপরাধ হইত না, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু নিস্বার্থহৃদয়া অহল্যা বিধবার সম্পত্তি গ্রহণে অস্বীকৃতা হইলেন। বিধবা বারম্বার অনুরোধ করিলে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "যদি আপনার নিজের অর্থের কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে আপনি তাহা আপনার পরলোকগত স্বামীর স্মরণার্থ দেবসেবায় এবং সাধারণের মঙ্গলজনক কার্য্যে ব্যয় করুন্;—তাহা হইলে আমি পরিতুষ্ট হইব।" অহল্যার পরামর্শানুসারে বিধবা আপনার সম্পত্তি নানাবিধ সৎকার্য্যে এবং দেবমন্দির ইত্যাদি নির্ম্মাণে ব্যয় করিলেন। অহল্যার উদ্দেশ্য সার্থক হইল। যাঁহাদিগের ধারণা আছে যে, অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারান্ধ হিন্দু রাজগণের অধীনে প্রজাগণের সুখশান্তি ছিল না, তাঁহাদিগকে আমরা অহল্যার ন্যায় রাজ্ঞীর শাসনকাল আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

অহল্যা রাজকার্য্য সম্বন্ধে একদিকে যেমন কোমলতা প্রদর্শন করিতেন, প্রয়োজন হইলে, অপর দিকে তেমনই কঠোরতা অবলম্বনেও পরাঙ্মুখী ছিলেন না। তাঁহার রাজ্যস্থ ভীল দস্যুদিগের দমনে তিনি যথেষ্ট তেজস্বিতা ও দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভীলগণ অহল্যার রাজ্যের নানা স্থানে এবং মালবের আসন্নবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে বাস করিত। তাহাদিগের অত্যাচারে নিরীহ পথিকগণ আপনাদিগের সম্পত্তি লইয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিতে পারিতেন না। ইংরাজ রাজত্বেও এই ভীল দস্যুগণ অদ্যাপি সম্যক্‌রূপ শাসিত হয় নাই। সুতরাং অহল্যার সময়ে তাহাদিগের উপদ্রব যে কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অহল্যা প্রথমতঃ, তাঁহার স্বাভাবিক কোমল ব্যবহার দ্বারা, ভীলদিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, তাহারা কোমলতায় পরিবর্ত্তিত হইবার পাত্র নহে, তখন তিনি অতি কঠোর দণ্ডবিধান দ্বারা তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। বহুসংখ্যক ভীল-দলপতি নিহত এবং ভীল-গ্রাম উৎসন্ন হইলে, ক্রমশঃ ভীলদিগের চৈতন্য হইল। তখন তাহারা অহল্যার প্রস্তাবানুরূপ কার্য্য করিতে স্বীকার করিল।

তাহাদিগকে পরাজিত এবং অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী দেখিয়া, অহল্যাও কোমল ব্যবহারে নিরস্ত হইলেন না। তিনি তাহাদিগকে দস্যুবৃত্তি ও মৃগয়া দ্বারা জীবন নির্ব্বাহের অপেক্ষা কৃষি ও ব্যবসায় ইত্যাদি উৎকৃষ্টতর উপায় দেখাইয়া দিলেন। ভীলদিগের মধ্যে অনেক দিন হইতে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল, যে প্রত্যেক পথিককে, তাহাদিগের অধিকার দিয়া যাইতে হইলে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর দিতে হইত। * অহল্যা তাহাদিগের এই পূর্ব্বাপর প্রচলিত স্বত্ব উচ্ছিন্ন করিলেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এইরূপ নিয়মও প্রচলিত করিলেন, যে প্রত্যেক ভীল-দলপতিকে তাঁহাদিগের অধীনস্থ প্রদেশে পথিকদিগের ধন ও প্রাণ রক্ষার জন্য দায়ী হইতে হইবে। অহল্যার এইরূপ যুগপৎ কঠোর এবং কোমল ব্যবহারে দুর্দ্দান্ত ভীলগণ ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া আসিল।

অহল্যা ভারতবর্ষের অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশের রাজন্যগণেরও সহিত সর্ব্বদা সংবাদ ও পত্রাদি বিনিময় করিতেন। অন্যান্য রাজ্যের প্রজাবর্গের অবস্থা অবগত

† এই কর "ভীল-কড়ি" নামে প্রসিদ্ধ। স্থানভেদে ইহার পরিমাণ বিভিন্ন। সাধারণতঃ ইহা, একটী বৃষ যত ভার লইয়া যাইতে পারে, তৎপরিমাণ দ্রব্যের উপর, আধ পয়সার অধিক নয়।

হইয়া, তাহাদিগের সহিত তুলনায়, নিজের প্রজাবর্গের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য, তিনি সর্ব্বদা উৎসুক থাকিতেন। হুলকার রাজ্যের নানা স্থানে তিনি বহু-সংখ্যক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গমনাগমনের সুবিধার জন্য তিনি বিন্ধ্য-পর্ব্বতের উপর দিয়া একটী পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পর্ব্বত এই খানে প্রায় লম্ব-ভাবে উত্থিত হইয়াছিল; সুতরাং ইহাতে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। হুলকার রাজ্যের নানা স্থানে তিনি দেবমন্দির, পথিকদিগের জন্য বিশ্রামাগার এবং কূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মলহররাও মৃত্যুকালে প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। অহল্যা, তাহার উত্তরাধিকারিণী হইয়াই, তাহা দান, অতিথিসেবা, দেবপূজা প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যয়ের জন্য, নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ নিয়ম ছিল যে, রাজ-কোষের উদ্বৃত্ত অর্থ একত্র করিয়া, তিনি [illegible] উপর অঞ্জলি-প্রমাণ গঙ্গাজল এবং কতকগুলি তুলসীপত্র নিক্ষেপ করিতেন। রাজপুরোহিত সেই সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করিতেন। তদবধি সেই অর্থ কেবলই নানারূপ সৎকার্য্যে ব্যয় হইত; কস্মিন্ কালেও, তাহার এক কপর্দ্দক অন্য কোন কার্য্যে ব্যয় হইতে পারিত না। তাঁহার নিজ

রাজ্যের উন্নতির জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার দয়া ও বদান্যতা কেবলই তাঁহার নিজ রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষের যে সকল স্থান হিন্দুধর্ম্ম মতে পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। জগন্নাথযাত্রিগণের গমনাগমনের জন্য, তিনি যে প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, জীর্ণ এবং অসংস্কৃত অবস্থায় এখনও তাহা সহস্র সহস্র পথিকের ক্লেশ নিবারণ করিতেছে। *

আমরা বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক প্রধান তীর্থক্ষেত্রে অহল্যার কীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই সকল প্রধান তীর্থক্ষেত্র ব্যতীত অপেক্ষাকৃত অ-প্রসিদ্ধ শত শত তীর্থেও তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। দাক্ষিণাত্যের অনেক গুলি তীর্থের দেবমূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিদিন তাঁহারই প্রদত্ত গঙ্গাজলে স্নাত ও ধৌত হইত। বহুশত ক্রোশ দূর হইতে প্রতিদিন এইরূপ গঙ্গাজল আনয়ন করিতে তাঁহার যে কত অর্থ ব্যয় হইত,

‡ কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট নামক জনৈক সৈনিক-কর্ম্মচারী, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হিমালয়স্থিত কেদারনাথ তীর্থে ভ্রমন করিতে যাইয়া দেখেন, যে অহল্যার নাম সেখানে সমাদৃত ও জাগ্রত রহিয়াছে। প্রায় তিন হাজার ফুট ঊর্দ্ধে, যেথানে অপর মনুষ্যাবাসমাত্র নাই, সেখানে অহল্যা পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য ধর্ম্মশালা এবং কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। শত শত ভারবাহী এই কার্য্যের জন্য নিয়মিত রূপ নিযুক্ত ছিল। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় এবং আন্তরিক বিশ্বাস ছিল বলিয়াই, তিনি এরূপ বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্যে কুণ্ঠিত হইতেন না। উপাস্য দেবতাকে আপনার বিশ্বাসানুরূপ কার্য্যের দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া, তিনি প্রজাবর্গের কল্যাণ সাধন করিবেন, এইরূপ বাসনা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই বলবতী থাকিত। একদিকে যেমনই তিনি প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসানুযায়ী অনুষ্ঠান করিতেন, অপর-দিকে তেমনি সার্ব্বজনীন ভাবে ভূচর, খেচর সকল প্রকার প্রাণিগণের সেবা করিতেও নিরস্ত থাকিতেন না। তিনি প্রতিদিন দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইতেন; বিশেষ বিশেষ উৎসব দিনে নিতান্ত নীচ জাতীয় ব্যক্তি-দিগকে প্রচুর পরিমাণে আহার করাইতেন; শীতকালে দারিদ্র্যপীড়িত বৃদ্ধদিগকে শীতবস্ত্র প্রদান করিতেন, এবং গ্রীষ্মের কয়মাস তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জল দান করিবার জন্য, রাজপথের স্থানে স্থানে সুশীতল জলকুম্ভ সহ লোক দণ্ডায়মান রাখিতেন। মিসিরের কৃষকগণ অনেকদিন দেখিতে পাইত, যে তাহাদিগের পরিশ্রান্ত মহিষ ও বৃষকে জল পান করাইবার জন্য রাজভৃত্য

জলপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি স্বয়ং একটী বৃহৎ ক্ষেত্র পক্ষীদিগের আহার্য্য শস্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নানা স্থান হইতে বিতাড়িত পক্ষী সমূহ দলে দলে আসিয়া সেখানে বাস করিত। মৎসদিগের জন্যও নর্ম্মদার জলে শক্তু এবং গোধুম-মণ্ড নিক্ষিপ্ত হইত। তীর্থক্ষেত্রে গমনের সময় তিনি নানাবিধ বৃক্ষের বীজ সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং সযত্নে রোপণ করিয়া আসিতেন। রৌদ্রতপ্ত পথিক তাহাদিগের তলে বিশ্রাম করিবে, ক্ষুধাতুরগণ তাহাদিগের ফলে তৃপ্তিলাভ করিবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এরূপ সার্ব্বজনীন দয়া অতি অল্প মানবপ্রকৃতিতেই লক্ষিত হয়। যে দেশে এবং যে সমাজে এরূপ দয়াময়ী রমণী জন্মগ্রহণ করেন, তাহা ধন্য। ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক রমণীগণের চরিত্র যে কেবল কবিকল্পনা নহে, অহল্যার ন্যায় ঐতিহাসিক রমণীর চরিত্রই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

অহল্যা যে সময় ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও সমৃদ্ধিমান্ দেশীয় নৃপতির অভাব ছিল না। নিজাম, টিপুসুলতান, অযোধ্যার নবাব, সিন্ধিয়া প্রভৃতি তাঁহার সমকক্ষ এবং তাঁহার অপেক্ষা ক্ষমতাবান্ আরও অনেক নরপতি সে সময়

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু সৎকার্য্যে তাঁহার সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সঙ্গে একত্র নামোল্লেখেরও যোগ্য আর কেহ ছিলেন না। বর্ষার ধারার ন্যায় তাঁহার করুণা সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বস্থানে নিপতিত হইত। তিনি যে সৎকার্য্যে এত অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা কোথা হইতে আসিত, সে সম্বন্ধে পাঠকের স্বভাবত কৌতূহল হইতে পারে। সংক্ষেপে সে কথার উত্তর এই যে তাঁহার আয় অন্যান্য রাজন্যবর্গের অপেক্ষা অনধিক হইলেও, তাঁহার ব্যয় তাঁহাদিগের ব্যয় অপেক্ষা অনেক ন্যূন ছিল। সাধারণ রাজন্যগণ, তাঁহাদিগের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যয় করিয়া, অনেক সময় প্রজাগণের হিতার্থ অর্থ-ব্যয় করিতে পারেন না। কিন্তু অহল্যার নিজের জন্য কিছুই ব্যয় ছিল না বলিলেও হয়। মুষ্টিমেয় আতপ তণ্ডুলে যাঁহার পরিতৃপ্তি, তাঁহার সৎকার্য্যে অর্থব্যয়ের প্রতিবন্ধক কি? রাজপদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তুকাজী তাহা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু অহল্যা নিজে তপশ্চারিণীর ন্যায় থাকিতেন; সেই জন্য তাঁহার কখনও সৎকার্য্যে অর্থাভাব হইত না। আরও একটী কারণ ছিল। অধিকাংশ রাজার সর্ব্বস্বই সৈনিক পরি-

পোষণে ব্যয় হইয়া থাকে; কিন্তু অহল্যার সৈনিক ব্যয় অতি পরিমিত ছিল। অল্প সংখ্যক সৈন্যের দ্বারাই তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি বর্ত্তমান রাখিয়াছিলেন; এবং সৈনিক-সেবায় অর্থব্যয় না করিয়া, সৎকার্য্যে ব্যয় করাতে, একটী অতর্কিত শুভফলও উৎপন্ন হইয়াছিল। অধিক সংখ্যক সৈন্য রাখিলেই প্রতিবাসিগণের মনে স্বভাবত অবিশ্বাস ও সন্দেহ উৎপন্ন হয়। অহল্যার সৈনিক সংখ্যার নূন্যতা হইতে, তিনি যে কাহারও সহিত বিবাদপ্রার্থিনী নহেন, সকলেরই মনে এইরূপ বিশ্বাস হইত; সুতরাং সাধ্যানুসারে কেহই তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিতেন না। সেই জন্যই অহল্যার রাজ্য ত্রিংশৎ বৎসর কাল শান্তি-সুখ ভোগ করিয়াছিল। অবিরত যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত থাকিলে, এরূপ শান্তি কখনই ঘটিত না। সুতরাং সাংসারিক জ্ঞান লইয়া বিচার করিলেও, অহল্যা তাঁহার রাজ্যে শান্তি রক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষা যে আর কোন উৎকৃষ্টতর উপায় হইতে পারে না, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—"রাজ্ঞী অহল্যার রাজত্বের

শেষাংশে আমি পুনায় কোন সম্ভ্রান্ত কার্য্যে নিয়োজিত ছিলাম। আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে, তাঁহার নাম উচ্চারণ মাত্র লোকের হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তি-ভাবের উদয় হইত। তাঁহার প্রতিবাসী নৃপতিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করা দূরে থাকুক, অন্যের আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজ্য রক্ষা না করা, প্রত্যবায়জনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কেবল তাঁহার স্বজাতীয় নরপতিগণ নহেন, হিন্দু, মুসলমান, সকলেই অহল্যার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। হায়দ্রাবাদের মুসলমান নৃপতি নিজাম, মহীশুরের দুর্দ্দান্ত, হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী টিপু সুলতান, এবং পুনার ব্রাহ্মণ পেশোয়া, সকলেই সমভাবে ঈশ্বরের নিকট তাঁহার কল্যাণ ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেন।”

কোন একটী ধর্ম্মসঙ্গীতে ভগবানের সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে, যে

“যে করে আমার আশ,
করি তার সর্ব্বনাশ।”

অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানকে কামনা করেন, তাঁহারা যেন নিজের সর্ব্বনাশ দেখিতে প্রস্তুত থাকেন; কখনও সাংসারিক সুখের প্রয়াসী না হন। করুণার প্রতিমূর্ত্তি

অহল্যার জীবন আলোচনা করিলে ভগবান তাঁহার দাস-দাসীদিগকে কিরূপ ঘোরতর পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বে অহল্যার প্রথম জীবনের মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি; শেষ জীবনে বিধাতা তাঁহার জন্য আরও গুরু দুঃখ রাখিয়াছিলেন। এইবার তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

তৃতীয় অধ্যায়।
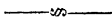
অহল্যার একমাত্র পুত্র মল্লরাও কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা উল্লেখ করিয়াছি। মল্লরাওয়ের মৃত্যুর পর অহল্যার দুহিতা মুক্তাবাই অহল্যার সাংসারিক শান্তি ও সান্ত্বনাস্থল হইয়াছিলেন। মুক্তাবাই বিবাহের পর স্বামিগৃহে বাস করিতেন, এবং অহল্যা, নিজের অপর সন্তান সন্ততির অভাবে, মুক্তার একটী পুত্রকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া, পুত্রবৎ স্নেহে প্রতিপালন করিতেন। এই বালকটীকে নিকটে রাখিয়া, অহল্যা পুত্রের অভাব কিয়ৎ পরিমাণে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার এমনই বিড়ম্বনা, মুক্তার পুত্র, যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, অহল্যার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং সে ঘটনার সম্বৎসর অতীত হইতে না

হইতে, পুত্রশোকাতুরা মুক্তা নিজেও বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইলেন। পুত্রবিয়োগের পর জামাতা এবং দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিয়া, অহল্যা কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং উপর্য্যুপরি এইরূপ বিপৎপাতে তাঁহার কোমল হৃদয় একবারে নিষ্পেষিত হইয়া গেল। কিন্তু এই স্থলেই তাঁহার যন্ত্রণার অবসান হইল না। পতিপরায়ণা মুক্তা স্বামীর অনুগমন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। অহল্যা কন্যাকে সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; তাঁহার সম্মুখে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া সেই বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া না যাইবার জন্য, বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুক্তা কিছুতেই আপনার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তিনি অতি সস্নেহে, কিন্তু দৃঢ়তার সহিত জননীকে বলিলেন; "মা, তুমি আর কতদিন বাঁচিবে? দুই চারি বৎসরের মধ্যেই তোমার এই পবিত্র জীবন শেষ হইবে। কিন্তু আমাকে আরও বহুদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। স্বামী এবং পুত্র-বিরহিত হইয়া, তোমার মৃত্যুর পর আমার যে কি অবস্থা ঘটিবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। জীবন তখন আমার পক্ষে ভারবহ হইবে। কিন্তু আজ আমি, সসম্মানে স্বামীর চিতা-

রোহণ করিয়া, যে শান্তি পাইব বলিয়া আশা করিতেছি, তখন সে অবসর থাকিবে না। মা, তুমি আমায় নিবারণ করিও না।" অহল্যা যখন দেখিলেন যে মুক্তা কিছুতেই নিবৃত্তা হইবার নহেন, তখন তিনি অগত্যা সম্মতি দান করিলেন, এবং স্বচক্ষে কন্যার চিতারোহণ দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, সহ-মরণের অনুযাত্রিগণের সঙ্গে তিনিও শ্মশান-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। পবিত্রসলিলা নর্ম্মদার উপকূল আলোকিত করিয়া, চিতা প্রজ্জলিত হইল। অহল্যার তাৎকালিক মানসিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহার হৃদয় খেচর ও জলচর প্রাণি-গণেরও জন্য ব্যথিত হইত, আজ তিনি আপনার প্রাণের পুত্তলিকে চিতায় বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহার মানসিক ভাব যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ধর্ম্মবিশ্বাসে এবং কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় মনুষ্যের হৃদয় যতদূর সবল হওয়া সম্ভব, অহল্যার হৃদয় ততদূর সবল ছিল। কিন্তু মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাসের নিকট জ্ঞান, যুক্তি, ধর্ম্মবিশ্বাস সমস্তই পরাভূত হইল। প্রথম হইতেই অহল্যার হৃদয় যদিও মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছিল, তথাপি তিনি কিয়ৎক্ষণ অবধি, ধীরভাবে

চিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন। কিন্তু-যখন অগ্নিশিখা মুক্তার সুকুমার দেহ স্পর্শ করিল এবং মুক্তার কাতর আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মুক্তার আর্ত্তনাদ নিমগ্ন করিবার জন্য, অনুযাত্রিগণ চিতা বেষ্টন করিয়া চীৎকার করিতেছিল, এবং শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতির শব্দে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিতেছিল। বৎসল-হৃদয়া অহল্যা সে অবস্থায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উন্মত্তার ন্যায়, সেই জনস্রোত ভেদ করিয়া, কন্যার চিতায় ঝাঁপ দিবার জন্য উদ্যতা হইলেন। তাঁহার দুই জন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী তাঁহার দুইটী হস্ত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি চিতায় ঝাঁপ দিতে পারিলেন না, কিন্তু নিজে নিজের হস্ত দংশন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মুক্তার এবং তাঁহার স্বামীর দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। অহল্যা, নর্ম্মদার জলে তাঁহাদিগের প্রেতকৃত্য সমাপন করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয় এরূপ ব্যথিত হইয়াছিল যে তিন দিন পর্য্যন্ত তিনি কোনরূপ আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় অপেক্ষাকৃত শান্ত

হইয়া আসিল। তিনি জামাতা ও দুহিতার উদ্দেশে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ একটী অতি সুন্দর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিলেন।*

এইরূপে অহল্যার রাজত্বকালের ত্রিংশৎবর্ষ পূর্ণ হইল। তাঁহার শাসনকালে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা অধিক সংঘটিত হয় নাই। শান্তভাবে, নিরাড়ম্বরে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল; সুতরাং ঐতিহাসিকগণ কোন প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহাদি উত্তেজক ঘটনার অভাবে, তাহাতে বর্ণনাযোগ্য অধিক উপাদান প্রাপ্ত হন্ না। ভগবানের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ, জীবের প্রতি করুণা এবং আশ্রিত-গণের প্রতি অনুকম্পা, ইহারই পৌনঃপুনিকতায় তিনি জীবন শেষ করিয়াছিলেন। নিজের সুখের প্রত্যাশা না করিয়া, কর্ত্তব্যপরায়ণ হৃদয় কিরূপ পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক এবং

* সার জন ম্যালকলম লিখিয়াছেন; "মাতৃস্নেহের নিদর্শন-স্বরূপ সেই স্মৃতিমন্দির অপেক্ষা সুন্দর মন্দির ভারতবর্ষে অতি অল্পই আছে।" তিনি আরও লিখিয়াছেন, "আমি অহল্যার একজন সম্ভ্রান্ত এবং প্রাচীন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার কন্যার চিতা-ভূমিতে গমন করিয়াছিলাম। যেখানে মুক্তার চিতা প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং যেখানে দণ্ডায়মান হইয়া, অহল্যা সেই হৃদয়ভেদী দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি তাহা আমাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।"

মাতৃস্নেহে প্রজাপুঞ্জকে প্রতিপালন পূর্ব্বক ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ষা'ট বৎসর বয়সের সময় অহল্যা পরলোক গমন করিলেন। স্বামী, পুত্র, কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রের শোকে তাঁহার শরীর ও মন উভয়ই জর্জ্জরিত হইয়াছিল, সুতরাং মৃত্যু তাঁহার নিকট অতি শান্তিময় বলিয়াই বিবেচিত হইল। হিন্দু-বিধবার জীবনের প্রতি মমতা কোন কালেই থাকে না; তাহার উপর শোকে, তাপে অহল্যা একবারে অবসন্নপ্রায় হইয়াছিলেন। শরীর অসুস্থ হইলেও তিনি নিয়মিত ব্রত, উপবাস ইত্যাদি হইতে বিরত থাকিতেন না; সেই জন্য মৃত্যু অতি সত্বরপদেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। যদিও তাঁহার নশ্বর, ধূলিময় দেহ পৃথিবীর ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও তাঁহার স্বদেশীয় সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণে ধর্ম্মভাব ও পবিত্রতা বর্দ্ধন করিতেছে।

অহল্যার প্রকৃতি এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যের দোষ গুণ আলোচনার পূর্ব্বে, তাঁহার আকৃতি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। তিনি শ্যামাঙ্গী ও কৃশকায়া ছিলেন। লোকে যাহাকে সৌন্দর্য্য বলে, তাহা তাঁহার ছিল না, বলিলেও হয়। রাঘবের (রঘুনাথ রাও পেশওয়ের)

রূপবতী কিন্তু দুঃশীলা পত্নী আনন্দীবাই, অহল্যার দেশ-ব্যাপী প্রশংসাবাদ শুনিয়া, তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ঈর্ষা-পরায়ণা ছিলেন। অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই মানসিক সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি থাকে। অহল্যা দেখিতে কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য, আনন্দীবাই একবার আপনার একজন পরিচারি-কাকে অহল্যার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পরিচারিকা ফিরিয়া যাইয়া আনন্দীকে বলিল যে, "অহল্যা দেখিতে সুন্দরী নহেন, কিন্তু কি যেন একটী স্বর্গীয় জ্যোতি তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই বিরাজিত রহিয়াছে।" সৌন্দর্য্য-গরবিনী আনন্দীবাই এই সংবাদে পরিতৃপ্তা হইলেন, এবং পরি চারিকাকে বলিলেন, "সে ত সুন্দরী নয়, তাহা হইলেই হইল।" হায়! সংসারের অনেক রমণীই এইরূপ অসার আত্মপ্রসাদ লইয়া পরিতৃপ্ত থাকেন।

অহল্যার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, আমরা তাহার আভাস পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। নারী-জনোচিত কোমলতার সহিত রাজকার্য্যোপযোগী কাঠিন্যের সেরূপ সুন্দর সম্মিলন পৃথিবীর অতি অল্প রমণীর প্রকৃতিতেই লক্ষিত হয়। তিনি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিতেন এবং অতি অল্প সময়েই লোকে তাঁহার ক্রোধ দেখিতে পাইত। কিন্তু যখন

কাহারও প্রতি তিনি সত্য সত্যই বিরক্ত হইতেন, তখন তাঁহার অতিবিশ্বস্ত পুরজনও কেহ তাঁহার সম্মুখে আসিতে সাহস করিতেন না। একদিকে অনুগতজনের প্রতি-পালনে মাতৃস্নেহ এবং অপর দিকে অত্যাচারীর দমনে ভীমভাব, উভয়ই তাঁহার প্রকৃতিতে সমরূপ বর্ত্তমান ছিল। আশ্রয়-প্রার্থিনী বিধবার পুত্রকে ক্রোড়ে লইবার সময়, তিনি আপনার রাজ্ঞীত্ব বিস্মৃত হইতেন; আবার অনৃতাচারীর দমনে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া, নিজের রমণী-সুলভ কোমলতাও তিনি বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন। গঙ্গাধর যশোবন্তের শাসনে এবং ভীল দস্যুদিগের দমনে তাঁহার প্রকৃতির এই কঠোর ভাব সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার বুদ্ধি স্বভাবতঃ অতি তীক্ষ্ণ ছিল, নিজের চেষ্টা ও যত্নে তিনি অতি সুন্দর-রূপ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহা-ভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ, তিনি অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন; এবং রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় অতি জটিল বিষয় সমূহও স্বয়ং পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহাদিগের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেন।

রাজস্ব, শাসন-কার্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যে সকল সুনিয়ম প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা

করিলে তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মের ও বিধিসমূহের উপর সাধারণের এরূপ শ্রদ্ধা ছিল যে, রাজ্য সম্বন্ধে কখনও কোন নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, তাহা অহল্যার প্রবর্ত্তিত নিয়মের বিরোধী কিনা, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করা হইত। রামচন্দ্রের রাজত্বকালের ন্যায় তাঁহারও রাজত্বকাল যেন আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী ভূপালগণের মধ্যে কেহ প্রজারঞ্জন করিতে চাহিলে, তিনি অহল্যার প্রদর্শিত পথেরই অনুসরণ করিতেন। কোন অভিনব রাজবিধি প্রবর্ত্তনের সময়, প্রবর্ত্তক যদি দেখাইতে পারিতেন যে, তাহা অহল্যার অনুমোদিত, তাহা হইলে লোকে বুঝিত যে, তাহা ধর্ম্মসঙ্গত, এবং কেহ কখনও তাহার বিরুদ্ধে একটীও কথা বলিতে সাহস করিত না।

বিংশতি বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই অহল্যার পতিবিয়োগ হয়; সুতরাং সাংসারিক সুখ তাঁহার জীবনে অতি অল্পই ঘটিয়াছিল। ইহার উপর পুত্র, দুহিতা, জামাতা, দৌহিত্র ইত্যাদির মৃত্যুতে তিনি একবারে শোকে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। সাংসারিক কোনরূপ সুখভোগ যে আর তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না, ইহা তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় সংসারের প্রতি বিরক্তি হও-

যাই স্বাভাবিক। অন্য অনেক নরপতি, এরূপ অবস্থায়, মন্ত্রিগণের উপর রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া, শান্তি-লাভ করিয়াছেন। কিন্তু অহল্যার কর্ত্তব্য-জ্ঞান এরূপ কঠোর ছিল এবং প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য তাঁহার অনুরাগ এরূপ প্রবল ছিল যে, তিনি কিছুতেই সেরূপ বৈরাগ্য অবলম্বন উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। তাঁহার স্বদেশীয় কবি তুকারাম, তাঁহার একটী অভঙ্গে (কবিতায়) এইরূপ বলিয়াছেন যে, যখন "যে কোন বিপদ উপস্থিত হইবে, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সাদরে তাহাকে আলিঙ্গন করিবে।" অহল্যার জীবনে তুকা-রামের এই উপদেশ সম্যক্‌রূপেই প্রতিপালিত হইয়াছিল। বিষয়ের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও আসক্তি ছিল না, অথচ তিনি এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাজ্যসংক্রান্ত প্রত্যেক বিষ-য়ের অনুসন্ধান লইতেন যে, ঘোর বিষয়ী ব্যক্তিও সেরূপ পারেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার সময় হুলকার রাজ্য যেরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, আর কখনও সেরূপ হয় নাই। তাঁহার প্রজাগণ এখনও যে তাঁহার নাম উচ্চারণমাত্র কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয় এবং লোকে এখনও যে তাঁহাকে দেবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার কারণ যথেষ্টই বর্ত্তমান আছে।

রাজ্ঞী অহল্যার দেবভক্তির ও জীবানুরাগের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃতিতে আরও এমন একটী গুণ ছিল, যে পৃথিবীর অতি অল্প রাজা ও রাজ্ঞীতে তাহা লক্ষিত হয়। যাঁহারা ধন ও প্রভুত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তোষামোদ তাঁহাদিগের নিকট নিত্য-প্রয়োজনীয় অন্নজলেরই ন্যায় বিবেচিত, হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা সেরূপ অবস্থাতেও চাটুবাদের অস্পৃষ্ট, তাঁহাদিগের প্রকৃতি দেবতুল্য। অহল্যার পক্ষে বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই ছিল যে, তিনি তোষামোদের বশবর্ত্তিনী ছিলেন না। একবার কোন ব্রাহ্মণ, অহল্যার অনুগ্রহ-ভাজন হইবার প্রত্যাশায়, তাঁহার গৌরববাণী-পূর্ণ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অধিকাংশ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের অভ্যাসানুরূপ, তিনি তাহাতে অহল্যার অতিরিক্ত প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। অহল্যা, যথাসাধ্য ধৈর্য্যের সহিত, গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন, এবং তাহার পর ব্রাহ্মণকে বিনীত বচনে বলিলেন ; "আমি অতি পাপীয়সী রমণী, আপনার এই-রূপ অতিরিক্ত প্রশংসার যোগ্য নই"। এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পুস্তকখানি লইয়া, নর্ম্মদার জলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন এবং তোষামোদকারী

ব্রাহ্মণের আর কোন সংবাদই লইলেন না। প্রশংসার আকর্ষণ এমনই সুমধুর যে, প্রশংসাকারীর বাক্য অসঙ্গত বলিয়া বুঝিলেও, তাহার প্রতি আমাদিগের অনুকম্পা জন্মে, এবং তাহার অভিলাষ অপূর্ণ রাখিতে ক্লেশ বোধ হয়। কিন্তু অহল্যা এই ঘটনা উপলক্ষে যে মনস্বিতা ও যে দৃঢ়-চিত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর অতি অল্প মনুষ্যেই তাহা দেখাইতে পারেন। সার জন ম্যাল্‌কম, সেই জন্য, যথার্থই বলিয়াছেন যে, অহল্যার ন্যায় রাজ্ঞী পৃথিবীর ইতিহাসে অতীব বিরল।

অহল্যার জীবনের ইতিহাস হইতে ভারতীয় নর-নারীগণ অতি সুন্দর উপদেশ লাভ করিতে পারেন। মানসিক শক্তি যে কেবল পুরুষেরই একাধিকৃত নহে, ইহা হইতে তাহা সুস্পষ্ট অনুমান করিতে পারা যায়। নারী হইয়াও যেরূপ সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলার সহিত তিনি আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, যে কোন পুরুষেরই পক্ষে তাহা গৌরব-জনক। উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে, রমণীও যে পুরুষ-সুলভ অনেক সদ্‌গুণের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, অহল্যার জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে রমণী এক্ষণে অনাদৃতা ও

অশিক্ষিতা। স্বামী পুত্রের কার্য্যে সহায়তা করিতে অক্ষমা ভাবিয়া, পুরুষ তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিতা করিয়া রাখিয়াছেন। এ দেশে রমণীর শক্তি ও সামর্থ্য, সাগর-গর্ভস্থিত রত্নের ন্যায়, নিষ্প্রভ ও নিরর্থক হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা রমণীকে কার্যক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিতা করিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন যে, নারীপ্রকৃতি পুরুষপ্রকৃতি হইতে বিভিন্ন; রমণীর পক্ষে কোমলতা এবং পুরুষের পক্ষে কাঠিন্য স্বাভাবিক; সুতরাং রমণীকে সংসারের কঠোরতার মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম কোমলতা বিনষ্ট হইয়া, সংসারের অকল্যাণ সাধিত হইবে। এ কথা যে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কোমলতার ও কাঠিন্যেরও এক একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। পুরুষ-প্রকৃতিতে যেমন কেবলই কাঠিন্য থাকিলে, তাহা রুদ্র-ভাবে পরিণত হয়, নারী প্রকৃতিতে তেমনই কেবল মাত্র কোমলতা থাকিলে, তাহাও সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালনের পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। বীণার প্রত্যেক তন্ত্রী হইতে একই সুর উৎপন্ন হইলে, তাহা প্রীতিকর হয় না; নরনারীর হৃদয়েরও বিভিন্ন বৃত্তি হইতে, কঠোরতাই হউক বা কোমলতাই হউক,

একই মাত্র ভাব উৎপন্ন হইলে, তাহা আনন্দ প্রদান করে না। এইজন্য কঠিনের সহিত কোমলের সম্মিলন, নর নারী উভয়েরই প্রকৃতির পক্ষে আবশ্যক। ইহার অভাব ঘটিলে, মানসিক সমস্ত বৃত্তির পরিস্ফুরণ হয় না। দুর্ভাগ্য ক্রমে এই বঙ্গদেশে অনেকেই সে কথা স্মরণ রাখেন না; সেই জন্য তাঁহারা নারী-প্রকৃতিতে কেবল মাত্র কোমলতারই বিকাশ দেখিতে চান; সাহস, তেজস্বিতা, আত্মনির্ভর-শীলতা প্রভৃতি গুণ পুরুষোচিত ভাবিয়া, তাহাদিগের পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে তাঁহারা তেমন মনোযোগ প্রদান করেন না। বলা বাহুল্য যে, নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই আদর্শ অপেক্ষাকৃত আধুনিক; প্রাচীন ভারত-সমাজে এ আদর্শ ছিল না। প্রাচীন ভারতের যিনি গণেশ-জননী রূপে মাতা, অন্নপূর্ণা রূপে গৃহিণী, মহিষ-মর্দ্দিনী রূপে, তিনিই আবার সমরাঙ্গণ-বিহারিণী। নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে মহারাষ্ট্র রাজপুত প্রভৃতি ভারতের বীরজাতিগণেরও আদর্শ বঙ্গবাসিগণের আদর্শ হইতে বিভিন্ন। বঙ্গসন্তান কেবলই কোমলতার পক্ষপাতী; কোমলতার প্রতি তাঁহার অস্বাভাবিক অনুরাগ বশতঃ, বঙ্গ-রমণী, মৃদুতায় পৃথিবীর অপর কোন দেশের রমণীর অপেক্ষা নিকৃষ্টা না হইলেও, তেজোহীনা এবং আত্ম-রক্ষণে অসমর্থা। অহল্যায় তেজ-

স্বিতার সহিত কঠোরতার সামঞ্জস্য হইয়াছিল বলিয়াই, আমরা তাঁহার এরূপ প্রশংসা করিতেছি এবং সেইজন্ত তাঁহাকে আমাদিগের নারীসমাজের আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

আধুনিক শিক্ষা এবং আদর্শ অনুসারে বিচার করিয়া, অহল্যার দোষগুণ পর্য্যালোচনা করিতে, আমাদিগের ইচ্ছা নাই। সে আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, সক্রেটিশ, বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের ন্যায় মহাপুরুষকেও কেহ কেহ কুসংস্কারান্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। অহল্যা যে জ্ঞান ও যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি কার্য্য করিতেন কিনা, এবং আত্মজীবন তদনুসারে ভগবানের ও ভগবানের সৃষ্ট জীবগণের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন কিনা, তাহাই আমাদিগের বিবেচনার বিষয়। খ্রীষ্ট কেন চৈতন্তের ন্যায় কার্য্য করেন নাই, সীতা বা সাবিত্রী কেন কুমারী নাইটিঙ্গেলের ন্যায় পরোপকার ব্রতে নিয়োজিতা হন নাই, একথা বলাও যেমন সঙ্গত, রাজ্ঞী অহল্যা আধুনিক কোন ব্রহ্মবাদিনীর ন্যায় কেন কার্য্য করেন নাই, সে কথা বলাও তেমনই যুক্তিযুক্ত। বিধাতার দানের তিনি যে অপব্যবহার

করেন নাই, ইহাই তাঁহার প্রধান গুণ, এবং তাঁহার স্রষ্টা তদনুসারেই তাঁহার কার্য্যের বিচার করিবেন। বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা অনেক রাজ্ঞী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু চরিত্রের পবিত্রতা, ভগবদ্ভক্তি, নিস্বার্থতা, সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পা, বিনয় প্রভৃতি সমস্ত গুণ লইয়া বিবেচনা করিলে, তাঁহার ন্যায় রাজ্ঞী পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন, বলিতে হইবে। রাজ্ঞী শব্দে হিন্দুর যাহা আদর্শ, তাহা যেন তাঁহাতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল। রাজসংসারের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিতা হইয়াও, তিনি সর্ব্বত্যাগিনী এবং রাজ্ঞী হইয়াও, তিনি সেবিকা ছিলেন। তাঁহার সেই শুভ্রবসন-পরিহিতা, ব্রতখিন্না ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি দেখিলে, তাঁহার প্রজাগণের হৃদয় মাতৃভক্তিতে বিগলিত হইত। করুণাময়ী রমণী রাজ্ঞী হইলে, তাঁহার দ্বারা প্রজাপুঞ্জের কিরূপ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে এবং সর্ব্বত্যাগিনী হিন্দুবিধবা কিরূপে, আত্ম-সুখনিরপেক্ষ হইয়া, সর্ব্বভূতের মঙ্গল সাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, অহল্যার জীবনে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। সহস্র সহস্র নরনারীর সুখ দুঃখের গুরুভার তাঁহার

হস্তে অর্পিত ছিল; কিন্তু তাঁহার গৌরবের বিষয় এই যে, আত্মসুখের জন্ত, তিনি কখনও কাহাকেও অসুখী করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলি যে, ভারতীয় পৌরাণিক রমণীগণের চরিত্র যে কেবল কবিকল্পনা নহে, অহল্যার স্থায় ঐতিহাসিক রমণীই তাহার প্রমাণ। ভারতবর্ষ অনেক মনস্বিনী রমণীর জন্মভূমি; তাঁহাদিগের সকলের নামের সঙ্গে, গ্রথিত হইয়া, অহল্যারও নাম এদেশে চিরস্মরণীয় হইবে।

পরিশিষ্ট।

"হোলকর' াচী কৈফিয়ৎ" (হোলকর বংশের বিবরণ) নামক বখর (ইতিহাস) গ্রন্থে অহল্যা বাই সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার কতিপয় আবশ্যকীয় অংশের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

কৈশোর-জীবন।

বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে আগমন অবধি অহল্যা বাই ভক্তিপূর্ব্বক শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবায় তৎপর ছিলেন। তাঁহার শ্বশুর সুভেদার মহ্লার রাও অতিশয় তেজস্বী, উগ্রস্বভাব ও কিয়ৎপরিমাণে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার অমিতব্যয়িতা ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য বালিকা অহল্যা বাই মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিতা হইতেন; কিন্তু তজ্জন্য তিনি কখনও শ্বশুরের প্রতি অভক্তি বা তাঁহার সেবায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। মহ্লার রাও পুত্রবধূকে তাঁহার বালিকাবস্থা হইতে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তাঁহার মনের বিরক্ত বা সন্তপ্ত অবস্থাতেও, অহল্যা যখন যাহা বলিয়া পাঠাইতেন, তিনি কখনই তাহার অন্যথা করিতেন না। তিনি সমস্ত পৃথিবীর চক্ষে "প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত ও কাল স্বরূপ" ছিলেন; কিন্তু

অহল্যা বাইয়ের প্রতি তাঁহার প্রীতির ও বিশ্বাসের সীমা ছিল না। এমন কি অহল্যা বাই তাঁহাকে "যতটুকু জল পান করিতে বলিতেন, তিনি ততটুকুই পান করিতেন।" অহল্যার শ্বশ্রূ গৌতমা বাইও কিঞ্চিৎ কোপনস্বভাবা ছিলেন। কিন্তু তিনিও অল্প বয়স্কা বধূর গুণে সম্পূর্ণ মুগ্ধা ছিলেন। অহল্যা তাঁহার শ্বশুর ও শ্বশ্রূর আদরের বধূ হইয়াও, কখনও সাংসারিক কার্য্যে ঔদাসীন্য করিতেন না। তিনি সমস্ত দিন সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, রাত্রি প্রহরাতীত হইলে, শয়ন কক্ষে গমন করিতেন, এবং শেষ ছয় ঘটিকা (দণ্ড) রাত্রি অবশেষ থাকিতে, শয্যা ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। আজীবন তিনি এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই অহল্যার প্রকৃতি পাপভীরু ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। "অম্বাদাস পৌরাণিক" নামক জনৈক সদাচারশীল ব্রাহ্মণের নিকট "পরত্রে সাধনের ব্যবস্থা" (দীক্ষা) গ্রহণ করিয়া, তিনি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ইষ্টদেবতার "দাস্য" করিতেন। পাছে তাঁহাকে বালিকা ভাবিয়া, তাঁহার শ্বশুর ও শ্বশ্রূ তাঁহাকে নিবারণ করেন, সেই ভয়ে তিনি অনেক সময় গোপনে পূজা, অর্চ্চনাদি করিতেন। যৌবনেও তিনি কখনও বিলাস সুখে বৃথা সময়

নষ্ট করেন নাই। শূদ্রাণী হইয়াও তিনি "শিষ্ট সম্প্রদায়" ব্রাহ্মণগণের ন্যায় নিত্য যথানিয়মে স্নান-সন্ধ্যা ও দেবা-র্চ্চনা করিতেন। ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহার জ্ঞাতি সম্বন্ধ ছিল না, এই মাত্র; নতুবা ধর্ম্মাচরণে তিনি সদা-চারশীল ব্রাহ্মণগণের অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন ছিলেন না।

২। পতি-বিয়োগ।

[১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে] "কুম্ভেরী" দুর্গ অবরোধ কালে অহল্যার স্বামী "খণ্ডে রাও" নিহত হন। বৃদ্ধ বয়সে সুভেদার মহ্লার রাও পুত্রশোকে অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। এই সময় অহল্যার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে তিনি অতিমাত্র শোকাকুল হইয়া, চিতারোহণের সঙ্কল্প করিলেন। অনেকেই নিষেধ করিল; কিন্তু কাহারও কথায় তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। পরিশেষে তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর (মহ্লার রাও) অশ্রু-পূর্ণ লোচনে গদ্গদ কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন,—"মা! তুমি কি আমাকে এই নিদাঘ-তপ্ত সংসার-মরুতে নিরাশ্রয় ও ছায়াহীন করিয়া ফেলিয়া যাইতে চাহিতেছ?

'খণ্ডুজী' এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে যে শোকার্ণবে ফেলিয়া গিয়াছে, তোমার মুখ চাহিয়াঃ আমি তাহা বিস্মৃত হইব, মনে করিতেছি। তুমি যদি আমার পৃষ্ঠপোষণ কর, তাহা হইলে, আমি "আমার অহল্যা মরিয়াছে, ও খণ্ডু জীবিত আছে" এইরূপ মনে করি। রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও সম্পত্তি রক্ষা বিষয়ে আমি তোমাকে "খণ্ডু" নাম প্রদান পূর্ব্বক (অর্থাৎ তোমাকে "আমার খণ্ডু" জ্ঞানে সমস্ত ভার তোমার উপর অর্পণ পূর্ব্বক) যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যবিস্তারাদি বাহ্য বিষয়ের চিন্তা লইয়াই থাকিব, মনে করিয়াছি। আমার সে আশা পূর্ণ করা, সে সৌভাগ্য রক্ষা করা, এখন তোমার হস্তে। ইহা ভাবিয়া যাহা তোমার কর্ত্তব্য বোধ হয়, কর। মা! আজ হইতে আমাকে তোমার সন্তান বলিয়া মনে করিবে।" এই বলিয়া সুভেদার (মহ্লার রাও) পুত্রবধূর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শোকবিহ্বল চিত্তে বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। করুণহৃদয়া অহল্যা, দুঃসহ পতিবিয়োগ-বেদনায় মুহ্যমানা হইয়াও, বৃদ্ধ শ্বশুরকে "ইষ্ট দেবতা স্বরূপ আরাধ্য জ্ঞানে", তাঁহার অনুরোধে, চিতারোহণের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন।

৩। রাজকার্য্যে সহায়তা।

খণ্ডে রাওয়ের মৃত্যুর পর হইতে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বন্দোবস্তের প্রতি দৃষ্টি রাখা, আয় ব্যয় ও ক্ষতি বৃদ্ধি গণনা, আশ্রিতগণের পালন ও ভৃত্যাদি নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্যের ভার অহল্যাবাইয়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহার শ্বশুর মহলার রাও যুদ্ধ বিগ্রহাদি ও দেশ জয় প্রভৃতি বাহ্য বিষয় লইয়াই থাকিতেন। অর্থ সংগ্রহ সুভেদারের পরাক্রম ও ভাগ্যের ফল; কিন্তু সুব্যবস্থা পূর্ব্বক তাহার সদ্ব্যয় করা অহল্যা বাইয়ের কার্য্য ছিল। কর্ম্মচারিগণ তাঁহার আদেশ ভিন্ন কোনও কার্য্য করিতে পারিতেন না। মহলার রাও সৈন্যসামন্তগণ সহ "বাফ্‌গাঁও" নামক স্থানেই থাকিতেন। অহল্যা বাই স্বয়ং সমস্ত রাজস্ব আদায় করিতেন এবং আয় ব্যয়ের হিসাব ও সৈন্যগণের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মহলার রাওয়ের নিকট প্রেরণ করিতেন। রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্যে কর্ম্মচারিগণের অপেক্ষা অহল্যা-বাইয়ের অধিকতর দক্ষতা দৃষ্ট হইয়াছিল। মহলার রাও, উগ্রপ্রকৃতি ছিলেন বলিয়া, সময় বিশেষে ক্রোধ বশে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কোনও গর্হিত বা গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, অহল্যা-

বাই ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে হিতকর উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্য হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতেন না। শ্বশুরের গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্রী ও প্রভূত ক্ষমতার অধিকারিণী হইলেও, ধন ও প্রভুতার সহচর অহঙ্কার কখনও অহল্যার তরুণ হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। তিনি অধিকাংশ সময় নর্ম্মদা তীরে বাস করিয়া "স্নান-সন্ধ্যা-সদাচার ও দান-ধর্ম্মে" সময়াতিপাত করিতেন।

৪। তেজস্বিতা ও সময়োচিত বুদ্ধিমত্তা।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে * মহ্লার রাও ইহ-লোক-পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পৌত্র (অহল্যার পুত্র) মালে রাও রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। মালে রাও রাজকার্য্যে নিতান্ত অপটু ও অতিশয় অব্যব-স্থিতচিত্ত ছিলেন। এই কারণে সুভেদারের পরলোক প্রাপ্তির পর হইতেই রাজ্য-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার অহল্যা বাইয়ের স্কন্ধে নিপতিত হইয়াছিল। মালে রাও "আত্মকৃত্য বিকৃতি বশতঃ" সিংহাসন প্রাপ্তির দশম মাসে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পত্নীদ্বয়ও স্বামীর চিতা-

* স্যার জন ম্যালকম সাহেব লিখিয়াছেন, "৭৬ বৎসর বয়সে মহ্লার রাওয়ের মৃত্যু হয়।" কিন্তু তাঁহার এই নির্দ্দেশ ভ্রমমূলক।

রোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর হইতে অহল্যার বৈরাগ্য, এবং দানধর্ম্মে ও দেবব্রাহ্মণের সেবায় অনুরাগ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পুত্রের ও পুত্রবধূদ্বয়ের লোকান্তর প্রাপ্তিতে তিনি কষ্ট-বহুল রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করতঃ তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম-চিন্তায় অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া "তুকোজী হোলকর" নামক মহ্লার রাওয়ের একজন নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় ও প্রিয়তম সেনাধ্যক্ষের উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভারার্পণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এমন সময়ে, এক অচিন্তিতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা অহল্যার শান্তিপ্রয়াসী শোক-তপ্ত হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল।

গঙ্গাধর যশোবন্ত নামে মহ্লার রাওয়ের একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী ছিলেন। মালে রাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার "বুদ্ধি বিপর্য্যাস" ঘটায়, তিনি এক অতি গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অহল্যা-বাইকে শোকার্ণবে নিমগ্ন, ও রাজ-বাটীর অপর সকল-কেই শোককাতর দেখিয়া, তিনি তদানীন্তন পেশোয়ার পিতৃব্য দাদা সাহেবকে (রাঘোবা দাদাকে) হোলকর রাজ্য স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য এক পত্র

প্রেরণ করিলেন। সেই পত্রের মর্ম্ম এইরূপ;—"এখানকার রাজ্য উত্তরাধিকারীশূন্য হইয়াছে। আপনি যে সুভেদারের পুত্র স্থানীয় ছিলেন,* এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। আপনি এই সময়ে শীঘ্র আসিয়া এই রাজ্য ও ধন সম্পত্তি হস্তগত করুন্। এখানে সকলেই শোকে অভিভূত ও দুঃখসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে। আপনি এ সময় ত্বরা সহকারে আসিতে না পারিলে, রাজ্য আক্রমণের এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সুযোগ আর পাইবেন না।" রাঘোবা এই প্রস্তাবে সম্মতি ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া, হোলকর রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ সর্ব্ব প্রথম শিবাজী গোপাল ও রাওজী মহাদেব নামক অহল্যার দুই জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর কর্ণগোচর হয়। কিন্তু অহল্যা বাইয়ের সেই শোকাকুলিত অবস্থায়, এই সংবাদ লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিতে পারেন, তাঁহাদের এরূপ সাহস ছিল না। এই কারণে, তাঁহারা সুভেদারের "হরকু-বাই ও উদা-বাই নাম্নী কন্যাদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক, সমস্ত ঘটনা

---

* রাঘোবা দাদার পিতামহ বালাজী বিশ্বনাথের সময় হইতে মল্লার রাও পেশওয়েগণের অধীনে কার্য্য করিতেন বলিয়া, রাঘোবা তাঁহাকে পিতৃব্য সম্বোধন করিতেন এবং মল্লার রাও নিজেও রাঘোবাকে ভ্রাতুষ্পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

তাঁহাদিগকে বিদিত করিয়া বলিলেন,—"সময় থাকিতে সাবধান না হইলে, শেষে পথের কাঙ্গাল হইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া হরকুবাই ও উদাবাই অহল্যার সমীপে গমন পূর্ব্বক আমূল বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।

অহল্যা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া, শোক সম্বরণ পূর্ব্বক, বিশিষ্ট তেজস্বিতা ও দৃঢ়তার সহিত, উপস্থিত ঘটনা সম্বন্ধে এইরূপে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন;—"পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণদ্বয় (গঙ্গাধর ও রাঘোবা) কৃতঘ্নতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাকে কেহও "সামান্যা নারী" মনে করিও না। আমি হস্তে বল্লম লইয়া দণ্ডায়মান হইলে, পেশওয়ের সিংহাসনও বিকম্পিত হইবে। আমার শ্বশুর স্বর্গীয় সুভেদার, তরবারিসহ শরীরক্ষয় করিয়া, বহুকষ্টে এই রাজ্য-সম্পদ লাভ করিয়াছেন,—তোমামোদের বলে লাভ করেন নাই। আমরা শিলেদার (সিল্লিদার)*। স্বর্গীয় মহারাজ যেরূপ ভাবে শ্রীমন্তের (পেশওয়ের) সেবকত্ব করিয়া গিয়াছেন, আমরাও সেরূপ

* যাহারা স্বীয় অশ্ব লইয়া অপরের অধীনে সৈনিকের কার্য্য করে, তাহাদিগকে শিলেদার বলে। এখানে "শিলেদার" অর্থে "যুদ্ধোপজীবী।"

ভাবে সেবকত্ব করিতে প্রস্তুত আছি (ক)। সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার ইচ্ছা থাকিলে, আমরা মোগলগণের বা ফিরিঙ্গী-গণের (খ) অধীনে চাকরী করিব—অথবা যাহা ভাল বুঝিব, তাহাই করিব। কিন্তু তাঁহারা যদি সুভেদারের রাজ্য ও ধনসম্পত্তি গ্রহণের চেষ্টা করেন, তবে কখনই সে চেষ্টা ফলবতী হইতে দিব না।" অহল্যা সর্ব্ব-সমক্ষে এইরূপ তেজোগর্ভ বাক্য বলিয়া, পরে কয়েক জন বিশ্বস্ত কর্ম্ম-চারীকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক মৃদুস্বরে বলিলেন ;—"অদ্যই ভোঁস্‌লে, গায়কওয়াড় (গুইকুমার) ও সেনাপতি দাভাড়ে প্রভৃতি মারাঠা মাণ্ডলিক নরপতিগণের নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করিয়া গুপ্তপত্র প্রেরণ কর এবং তুকোজী রাও হোলকরকেও আনয়নের জন্য উদয়পুরে দূত প্রেরিত হউক। যাহাতে মন্ত্রভেদ না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবে।"

মারাঠা মাণ্ডলিক নরপতিগণকে যে পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ;—"কৈলাসবাসী সুভে-দার পেশওয়ে-রাজ্যের ভিত্তি খনন করিয়া, স্বহস্তে

(ক) মল্লার রাও পেশওয়েগণকে দিগ্বিজয় বা বিদ্রোহ দমনাদি কার্য্যে সহায়তা করিতেন।

(খ) পোর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিগণ তৎকালে ফিরিঙ্গী নামে পরিচিত ছিলেন।

ইষ্টক স্থাপন পূর্ব্বক, এই বিশাল সাম্রাজ্যরূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দৈবদোষে আজ ঈশ্বর আমাদের প্রতি বিরূপ। এইরূপ সঙ্কট সময়ে আশ্রিতগণকে আশ্বাস প্রদান ও তাহাদিগের জাইগীর রক্ষা পূর্ব্বক তাহাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করা—শ্রীমন্তদিগের (অর্থাৎ পেশওয়েগণের) কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা না করিয়া, তাঁহারা পাপ বাসনাকে মনে স্থান দিয়াছেন—আমাদিগের ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের ভাগ্যে যাহা থাকে, তাহা আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে; কিন্তু অদ্য আমরা যেরূপ সঙ্কটে পতিত হইয়াছি, সময় বিশেষে আপনাদেরও সেইরূপ সঙ্কটে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সকল কথার বিচার করিয়া সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠাইবেন।"

এইরূপ পত্র প্রাপ্ত হইয়া, গায়কওয়াড় (গুইকুমার) বিংশতি সহস্র সৈন্য অহল্যা বাইয়ের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। ভোঁস্‌লে সসৈন্যে নর্ম্মদা তীরে (হুসঙ্গাবাদে) ছিলেন। তিনিও যথাসাধ্য সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দূত প্রেরণ করিলেন। অপরাপর মাণ্ডলিক নরপতি ও সর্দ্দারগণও আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "মহ্লারজী হোলকরের নিকট উপকৃত নহে,

এমন এদেশে কে আছে ? আবশ্যক হইলে আমরা আপনার নিকটেই আছি, জানিবেন।" ন্যায়-পরায়ণ-দূরদর্শী পেশোয়া মাধব রাওকেও এ বিষয়ে পত্র লিখিত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট হইতে উত্তর আসিল যে,—"তোমাদের রাজ্য ও ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে যাহার মনে পাপাভিলাষ উদয় হইবে, তোমরা তাহাকে নিঃসঙ্কোচে দণ্ডিত করিতে পার। আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। তোমরা দুই জন কর্ম্মচারীকে প্রতিনিধি স্বরূপ এখানে রাজসভায় পাঠাইয়া দিবে।"

এদিকে তুকোজী রাও হোলকর পত্র প্রেরণের ষষ্ঠ দিবসের অপরাহ্নে উদয়পুর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবামাত্র অহল্যাবাই তাঁহাকে সাদরে "অভ্যঙ্গ স্নান" করাইয়া "অভিষেক বসন" প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ও কার্য্যাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত করিলেন। এবং তাঁহাকে সেই দিনই এক প্রহর রাত্রের মধ্যে সৈন্যসহ ইন্দোরের বহির্ভাগে "গাড়রা খেড়া" নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এই সকল কার্য্য এরূপ ব্যস্ততার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল যে, অহল্যাবাই এবিষয়ে কাহারও পরামর্শ গ্রহণ বা শুভক্ষণ নির্ণয় বিষয়ে চিন্তা করিবারও অবকাশ প্রাপ্ত

হন নাই। সেনাপতি দাভাড়ে ও গায়কওয়াড়, অহল্যা-বাইয়ের সাহায্যের জন্য, যে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের ব্যয়ের জন্য অহল্যাবাই রাজকোষ হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ* প্রদান পূর্ব্বক রাঘোবা দাদাকে বাধা দিবার জন্য তাহাদিগকে উপযুক্ত স্থানে অবস্থিতি করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

৫। রাঘোবার অভিযানের পরিণাম।

[১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে] গঙ্গাধর যশোবন্ত ও রাঘোবাদাদা ৫০ সহস্র সৈন্য সহ ইন্দোর আক্রমণমানসে সিপ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ-মাত্র তুকোজী রাও হোলকর "মাতুশ্রী অহল্যাবাইয়ের" চরণ বন্দনা পূর্ব্বক রাঘোবাকে বাধা দিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত "কুচ" করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সিপ্রা তীরে উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী এক গিরি সঙ্কটে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পর দিন দাদা সাহেবের সৈন্যগণ সিপ্রা উত্তীর্ণ হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তুকোজী রাও দাদা সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "সিপ্রা উত্তীর্ণ হইলেই

* মল্লার রাও হোলকর বার্ষিক ৭৬লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ও নগদ ১৬ কোটী টাকা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তরবারী হস্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হইবেন।”

তুকোজীর প্রেরিত এই নির্ভীক সংবাদ শ্রবণে দাদা সাহেব চিন্তিত হইলেন। অহল্যাবাইয়ের সমর সজ্জার আয়োজন দেখিয়া তাঁহার “বীরশ্রী” নির্ব্বাপিত প্রায় হইয়া আসিয়াছিল। অহল্যাবাইকে বশীভূত করা পূর্ব্বে যে পরিমাণে তাঁহার সহজ বোধ হইয়াছিল, এখন সেই পরিমাণেই উহা অসাধ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিশেষতঃ এই কার্য্যে শ্রীমন্তের (পেশওয়ে মাধব রাওয়ের) সম্মতি ছিল না। এই সকল কারণে দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আর তাঁহার সাহস হইল না। তদ্ভিন্ন মহ্লাররাও-কৃত উপকার সমূহের বিষয় স্মরণ করিয়াও তিনি স্বীয় ব্যবহারের জন্য কিয়ৎ পরিমাণে অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু স্বীয় পাপ উদ্দেশ্য গোপন রাখিবার জন্য, তিনি কপটতা পূর্ব্বক তুকোজী রাও হোলকরকে বলিয়া পাঠাইলেন যে,—“মালেরাও বাবা লোকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয়া, আমরা পুত্রশোককাতরা অহল্যাবাইকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য আগমন করিয়াছি। তোমরা বিপরীত বুঝিয়া যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছ কেন?” তুকোজী,

রাও রাঘোবার এই চাতুরীপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন,—"যদি কৃপা-পরবশ হইয়া অহল্যার সান্ত্বনার জন্য আগমন করিতেছেন, তবে এত সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিবার প্রয়োজন কি ?" এই কথায় রাঘোবা বুঝিতে পারিলেন যে, তুকোজীর মনের সন্দেহ এখনও দূরীভূত হয় নাই। এই কারণে, তিনি স্বয়ং এক শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক ১০।১২ জন সর্দ্দার সহ হোলকরের শিবিরে গমন করিলেন। তুকোজী তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য, পদব্রজে শিবিরের বাহিরে আগমন পূর্ব্বক, যথাবিধি তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। পরে উভয়েই মলেরাওয়ের জন্য শোক প্রকাশ করিলেন।

সেই দিবসই রাঘোবা, স্বীয় সৈন্য সামন্তগণকে উজ্জয়িনীতে রাখিয়া, কয়েক জন মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে তুকোজীর সহিত ইন্দোরে গমন করিয়া অহল্যাবাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। অহল্যাবাই স্বীয় প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী একটি অট্টালিকা রাঘোবার নিবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। রাঘোবা এখানে এক মাস ছিলেন। এই এক মাসের মধ্যে ৪।৫ বার "সেব্য ও সেবকের কর্ত্তব্য ও সম্বন্ধ" বিষয়ে অহল্যার সহিত দাদা সাহেবের কথোপকথন হইয়াছিল। কিন্তু মল্লার

রাওয়ের সময় হইতেই অহল্যাবাই রাজ্য-সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, ও নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত পুণ্য দ্বারা তিনি এরূপ শক্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, বিচার বিতর্কে কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। দাদা সাহেব "পুণ্যজ্যোতি বিমণ্ডিত" অহল্যাবাইয়ের সহিত বিচার বিতর্কে জয় লাভ করিতে না পারিয়া, তুকোজীকে বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান দ্বারা সম্মানিত করত স্বীয় শিবিরে (উজ্জয়িনীতে) প্রতিগমন করিলেন। *

---

* বখরকারের লেখার ভাবে বোধ হয় যে, রাঘোবা দাদা অহল্যার সহিত স্বামী-শূন্য হোলকর রাজ্যের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাবিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক, যাহাতে হোলকর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন কার্য্যে পেশওয়েগণের সাহায্য গৃহীত হয়, তদ্বিষয়ে কৌশলে অহল্যাকে সম্মত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তীক্ষবুদ্ধি দূরদর্শিনী অহল্যা তাঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া কিছুতেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই ; তিনি স্বীয় অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে তাঁহার সমস্ত যুক্তি তর্কের খণ্ডন করিয়াছিলেন। কাজেই রাঘোবা নিরুপায় ও বিফলমনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হন।

গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে, এই সময়ে রঘুনাথ রাও কথা প্রসঙ্গে অহল্যাকে দত্তক গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অহল্যা সে প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া বলিলেন,—"অল্প বয়স্ক বালককে এখন দত্তক গ্রহণ করিলে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সে কিরূপ স্বভাব-চরিত্র-বিশিষ্ট ও কতদূর কার্য্যদক্ষ হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। এই কারণে রাজ্যশাসনক্ষম কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার প্রদান করা; আমি অধিকতর সুসঙ্গত মনে করি।" এই জন্যই অহল্যা বাই প্রাপ্তবয়স্ক তুকোজী হোলকরকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দাদা সাহেব ইন্দোর পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, অহল্যাবাই তাঁহার সাহায্যার্থে সমাগত ভোঁসলে, গায়কওয়াড় প্রভৃতি মারাঠা সর্দ্দারগণকে ও তাঁহাদের অনুযাত্রী প্রায় দেড় সহস্র প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে ভোজনার্থ স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনান্তে তিনি সকলকে যথাযোগ্য বস্ত্রভূষণাদি প্রদান পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা প্রকাশক ও সদ্ভাববর্দ্ধক বাক্য দ্বারা আপ্যায়িত ও গৌরবান্বিত করিয়া বলিলেন,—"এই সঙ্কটকালে আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের সাহায্য ও উপকার করিলেন বলিয়াই আমরা সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা পাইলাম।" অহল্যাবাই কর্তৃক এইরূপে সৎকৃত ও সম্মানিত হইয়া তাঁহারা স্ব স্ব দেশে প্রতিগমন করিলেন।

এই ঘটনায় অহল্যার যেরূপ তেজস্বিতা, বুদ্ধিমত্তা, প্রভাব, বিনয় ও কৃতজ্ঞতাদি গুণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর ও বুন্দী প্রভৃতি প্রদেশের অধিপতিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার বন্ধুত্ব লাভের জন্য, তাঁহার স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণের সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে নানাবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। অহল্যাবাইও তাঁহাদিগের প্রদত্ত উপঢৌকনের প্রতিদানে উপযুক্ত উপায়নাদি প্রেরণ দ্বারা তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

৬। পেশওয়ের সভায় প্রতিষ্ঠা।

শ্রীমন্ত মাধব রাওয়ের আদেশানুসারে * অহল্যাবাই স্বীয় দেওয়ান্ নারো গণেশ (নারায়ণ গণেশ) ও শিবাজী গোপাল নামক জনৈক কর্ম্মচারীকে তুকোজী রাও হোল-করের সহিত পুনায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। পেশওয়ের রাজসভায় তাঁহারা উপস্থিত হইলে, শ্রীমন্ত স্বমুখে অহল্যা বাই ও তুকোজী রাওয়ের বহুল প্রশংসা করিলেন। হোলকর রাজ্যের জন্য এক জন কর্ম্মকারক (agent) নিযুক্ত করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রীমন্ত বলিলেন, "এখান হইতে কোনও ব্যক্তিকে কর্ম্মকারকের পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলে, তাহার সহিত তোমাদের মনের ও মতের মিল হইতে অন্ততঃ এক বৎসর লাগিবে। এইকারণে, অহল্যা বাই স্বীয় অধীনস্থ যে কোনও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে মনোনীত করিবেন, আমরা তাঁহাকেই আমাদের পক্ষ হইতে নিযুক্তিপত্র প্রদান করিব।" পরিশেষে অহল্যা বাইয়ের নির্দ্দেশ ক্রমে শ্রীমন্ত শুভদিন দেখিয়া নারো গণেশকে স্বীয় কর্ম্মকারকের পদে নিযুক্ত করিলেন। (ক)

* পরিশিষ্ট ১২ পৃষ্ঠার ৭ম পংক্তি দ্রষ্টব্য।

(ক) এই ঘটনায় অহল্যা বাইয়ের সততার প্রতি পেশওয়ে মাধব রাওয়ের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে।

৭। নিয়ম লঙ্ঘনকারীর প্রতি কঠোরতা।

তুকোজীরাও হোলকরের পুনায় অবস্থান কালে, শিবাজী গোপালের কার্য্যদক্ষতাদি গুণে পেশওয়ে মাধব রাও অতিশয় প্রীত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় অধীনে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তুকোজী রাও শ্রীমন্তের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, নারো গণেশের অনুরোধে ও প্ররোচনায় শিবাজী গোপালকে শ্রীমন্তের সেবকত্ব স্বীকার করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। শিবাজী গোপালও আহ্লাদের সহিত ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু এ বিষয়ে অহল্যা বাইয়ের সম্মতি গৃহীত হইল না।

কিছু দিন পরে তুকোজী রাও ও নারো গণেশ ইন্দোরে প্রত্যাগমন করিলে, শিবাজী গোপালের নিয়োগের সংবাদ শুনিয়া অহল্যা বাই অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। তুকোজী রাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—"তোমাদের ব্যবহারে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে, এই রাজ্য ও ধন সম্পত্তির সহিত যেন আমার কোনও সম্পর্ক নাই। নতুবা শিবাজী গোপালের নিয়োগে আমার সম্মতি গ্রহণ করা তোমরা অনাবশ্যক বিবেচনা করিবে কেন? ঈশ্বর পূর্ব্বেই আমাকে

সর্ব্বপ্রকার পাশ হইতে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ভালই হইল; এখন হইতে নর্ম্মদাতীরে পুণ্যতম "মহেশ্বর" ক্ষেত্রে শেষের এই কয়দিন স্নানসন্ধ্যায় অতিবাহিত করিয়া জীবন সার্থক করিব, মনে স্থির করিয়াছি। রাজ্যের সমস্ত ভার অগ্রেই তোমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। এখন যাহাতে স্বর্গীয় সুভেদারের কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া শ্রীমন্তের অনুগ্রহ ভাজন হইতে পার, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিবে। অধিক আর কি বলিব? আমার সংবাদ কত দূর লইবে না লইবে, তাহা ত দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে।"

অহল্যা বাইয়ের এই অভিমানপূর্ণ নিষ্ঠুরবাণী শ্রবণ করিয়া, তুকোজী স্বীয় ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইয়া, নিজেই নিজের গণ্ডে চপেটাঘাত ও অহল্যার চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"কৈলাসবাসী সুভেদার জীবিত থাকিতে, জ্ঞাতি-বিরোধাদি বিস্মৃত হইয়া, আজীবন ক্রীত-দাসের ন্যায় তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছি। সুভেদার প্রত্যেক বিষয়ে আপনার উপর ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। আমার প্রতি সুভেদারের অনুগ্রহ দেখিয়া, আপনি আমাকে মানুষ করিয়াছেন। এই কারণে, আপনিই আমার সুভেদার ও প্রত্যক্ষ "মাতুশ্রী" (জননী)।

প্রাণ য়াউক্ অথবা থাকুক্, স্বয়ং মার্ত্তণ্ড (তুকোজীর কুল-দেবতা) আসিলেও, আর আপনার সহিত প্রতারণা করিব না, অথবা আপনার চরণ হইতে তিল মাত্র বিচ্যুত হইব না। এবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমার প্রতি সদয় হউন্।"

তুকোজীকে প্রকৃত অনুতপ্ত জানিয়া, অহল্যাবাই বলিলেন,—"মুখে বলায় কোনও ফল নাই; কার্য্যে যাহা দেখিব, তাহাই সত্য বলিয়া জানিব। কথা মত কার্য্য করিলে, ঈশ্বর কখনও উপেক্ষা করেন না।" এই ঘটনার পর হইতে তুকোজী আর কখনও অহল্যাবাইয়ের সম্মতি ও অনুমতি ভিন্ন কোনও কার্য্য করেন নাই।

৮। অহল্যা বাইয়ের নির্ভীকতা।

[১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ]

মাহাদজী সিন্দের সেনাপতি 'জীউবা দাদা বক্সী'র সহিত তুকোজীর কোনও কারণে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। এই কারণে, তুকোজী রাও হোলকর জয়পুরের রাজার নিকট তাঁহাদিগের প্রাপ্য কর আদায় করিবার জন্য গমন করিলে, জিউবা দাদা জয়পুরপতিকে তুকোজীর বিরুদ্ধে গোপনে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জয়পুরের রাজার নিকট হোলকরবংশীয়গণের প্রায় ৩।৪

লক্ষ টাকা কর বাকী ছিল। তুকোজী হোলকর সেই টাকা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে, জয়পুরপতির দেওয়ান "দৌলত রাম" এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন,— "আমাদিগের দেয় কর প্রদান করিতে আমাদের আপত্তি নাই ; কিন্তু আমরা সিন্দের ও আপনাদিগের, উভয়েরই নিকট ঋণী আছি। আপনাদিগের মধ্যে যিনি অধিক ক্ষমতাশালী হইবেন, তিনিই আমাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিবেন।" এই উত্তরে তুকোজী রাও জয়পুর পতির মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অপর দিক হইতে জীউবা দাদা সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করায় তুকোজীকে পরাজিত হইতে হইল। এই যুদ্ধে তুকোজীর কয়েকজন সেনাপতি ও সাহসী যোদ্ধা নিহত হওয়াতে, তিনি তথা হইতে পলায়ন করিয়া, জয়পুরের ২২ ক্রোশ দূরস্থিত "ব্রাহ্মণ গাঁও" নামক স্থানের সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

অহল্যা বাই এ সময়ে মহেশ্বর ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তুকোজী রাও তাঁহাকে পত্র দ্বারা এই সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিয়া সৈন্য ও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অহল্যা বাই এই সংবাদ শ্রবণে অতি মাত্র

ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন,—"তুকোজী যুদ্ধে নিহত হইলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না; কিন্তু যাহারা এত দিন ভৃত্যের ন্যায় আমাদিগের অনুগত ছিল, এই বৃদ্ধ বয়সে তাহাদিগের হস্তে এরূপ অপমান সহ্য হয় না।" * তাহার পর তুকোজীর সাহায্যের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা প্রেরণ করিয়া, অহল্যা এই মর্ম্মে তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন যে, "হতাশ বা ভীত হইও না। সাহস পূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্নকে দণ্ডিত করিবে। আমি তোমার সাহায্যের জন্য সৈন্যের ও অর্থের সেতু বাঁধিয়া দিতেছি। বার্দ্ধক্য বশতঃ যদি তোমার যুদ্ধে সামর্থ্য ও উৎসাহ না থাকে, তাহা হইলে আমাকে পত্র লিখিবে; আমি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইব।"

তুকোজীকে এইরূপ পত্র প্রেরণ করিয়া, অহল্যাবাই, "শিলেদার" (অশ্বারোহী সৈনিক) সংগ্রহ করিবার জন্য, ১০।১২ জন কারকুনকে খান্দেশ ও অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিলেন। অল্প কালের মধ্যেই অষ্টাদশ সহস্র শিলেদার সংগৃহীত হইয়া তুকোজীর সাহায্যের জন্য প্রেরিত হইল।

অহল্যা বাইয়ের নিকট হইতে সাহস ও উৎসাহপূর্ণ

---

* এই সময় অহল্যার বয়ঃক্রম ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

পত্র এবং প্রচুর সৈন্য ও অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, তুকোজী রাও জীউবা দাদাকে আক্রমণ করিলেন। প্রায় তিন মাস যুদ্ধের পর জীউবা পরাজয় স্বীকার করিলেন। তিনি স্বীয় অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, যুদ্ধের অবসান হইল। *

১। অহল্যার চতুরতা।

মহারাষ্ট্র দেশের সুপ্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক ও লেখক ৺ গোপাল রাও হরি দেশমুখ প্রণীত "ঐতিহাসিক গোষ্ঠী" ("ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাবলী") নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে অহল্যা বাই সম্বন্ধে যে দুইটি আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সারাংশ নিম্নে অনুবাদিত হইল।

সুভেদার মহ্লার রাও হোলকরের মৃত্যুকালে তাঁহার ধনাগারে প্রায় ১৬ কোটী টাকা সঞ্চিত ছিল। রাঘোবা দাদা এই সংবাদ অবগত হইয়া, একবার, মালবের নিকটবর্ত্তী কোনও প্রদেশে অবস্থান কালে, ঐ টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে অহল্যা বাইকে বলিয়া পাঠাইলেন যে,—

---

* এ সম্বন্ধে স্যার জন মালকম সাহেব লিখিয়াছেন,—"It was more of a quarrel between Tukajee and Mahadjee's commander, than between the Sindhia and Holkar families. P. 142

"সৈন্য ব্যয়ের জন্য আমাদের অর্থের অত্যন্ত অনাটন পড়িয়াছে। আপাততঃ আমাদিগকে কিছু অর্থ সাহায্য করুন্।" অহল্যা বাই রাঘোবার প্রকৃতি জানিতেন। তিনি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আমি সমস্ত টাকা দান ধর্ম্মে ব্যয় করিবার জন্য রাখিয়াছি। আপনার যদি অর্থের আবশ্যক থাকে, তাহা হইলে আমি সঞ্চিত অর্থের উপর তুলসী পত্র স্থাপন, গঙ্গাজল সেচন ও যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া, (যাচক) ব্রাহ্মণ জ্ঞানে আপনাকে দান করিতে প্রস্তুত আছি।" গর্ব্বিতস্বভাব রাঘোবা, প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের ন্যায় এরূপ ভাবে দান গ্রহণ করিতে সম্মত না হইয়া, অভিমানে তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। ইহাঁর উত্তরে অহল্যা বাই বলিলেন,—"যুদ্ধে প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি দান ধর্ম্মের জন্য সংকল্পিত অর্থ অন্য কার্য্যে ব্যয় করিব না।"

পরদিন রাঘোবা যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইলে, অহল্যা বাই বীর বেশে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিতা পাঁচ শত দাসীর সহিত রাঘোবার সম্মুখীন হইলেন। অহল্যা বাই জানিতেন যে, মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ রমণীর সহিত কখনও যুদ্ধ করিবেন না; সুতরাং বিনা যুদ্ধে তাঁহার

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। এই কারণে, তিনি সৈন্য সামন্তের পরিবর্ত্তে কেবল আপনার দাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, ফলেও তাহাই ঘটিল। রাঘোবা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার অধীনস্থ মারাঠা সর্দ্দারগণ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন রাঘোবা নিরুপায় হইয়া অহল্যা বাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আপনার সৈন্য সামন্ত কোথায়?" উত্তরে অহল্যাবাই বলিলেন,—"আমরা পেশওয়েগণের সেবক। তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, আমরা রাজ-বিদ্রোহী হইতে ইচ্ছা করি না; তবে হোল্‌কর বংশের ধর্ম্মার্থ উৎসৃষ্ট সম্পত্তি রক্ষা করাও আমার কর্ত্তব্য, সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি; আপনার যদি ইচ্ছা হয়, আপনি আমাকে ও আমার এই দাসীগণকে নিহত করিয়া, আমার ধর্ম্মার্থ রক্ষিত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারেন। আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া বৈরসাধন করিতে আমার ইচ্ছা নাই।"

অহল্যার এই কৌশলপূর্ণ উত্তর শ্রবণ করিয়া, রাঘোবা নিরুত্তর হইলেন; এবং স্বীয় ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া, অহল্যাকে প্রীত করত, অভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিলেন।

২। অহল্যার ধর্ম্ম জ্ঞান।

অহল্যার রাজত্ব কালে, কোনও ধনবান্ বণিকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার বিধবা স্ত্রী, দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার অধিকার প্রাপ্তির জন্ম, অহল্যা বাইয়ের নিকট প্রার্থনা করেন। অহল্যার কর্ম্মচারীগণ, বণিক্-পত্নীর নিকট হইতে উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া, দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে, অহল্যাকে পরামর্শ প্রদান করিলেন। উপঢৌকন গ্রহণের অনুকূলে তাঁহারা এই যুক্তি প্রদর্শন করিলেন যে, বণিক্পত্নীর প্রচুর ধন সম্পত্তি আছে। কর্ম্মচারীগণের এইরূপ পরামর্শ ও যুক্তি শ্রবণে অহল্যা বাই বলিলেন, "আবেদনকারিণীকে দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি; কিন্তু সে জন্ম তাহার নিকট হইতে উপঢৌকন কেন গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার স্বামী পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। স্বামীর উপার্জ্জিত সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্ম বিধবা দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণই তাহাকে দত্তক গ্রহণের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা রাজা, সুতরাং ক্ষমতাশালী;—পাছে

আমাদিগের বিনানুমতিতে দত্তক গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, আমরা, শাস্ত্র মর্যাদা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক, তাহার কার্য্যে বাধা দিই, এই ভয়েই সে আমাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। অতএব তাহাকে এই বলিয়া অভয় প্রদান করা উচিত যে, 'শাস্ত্রসম্মত কার্য্য করিতে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে; তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করিতে পার'। তাহাকে এইরূপ অনুমতি প্রদান করিতে আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এই অনুমতি প্রদানের জন্য যদি তাহার নিকট হইতে উপ-ঢৌকন গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে সে তাহা দিতে পারে সত্য, কিন্তু এইরূপে গৃহীত উপঢৌকন চোরিত ধনবৎ আমার মনে হয়; অথবা ইহাকে দস্যুতা দ্বারা অর্জ্জিত ধন বলিলেও অসঙ্গত হয় না। এই কারণে তাহার নিকট হইতে উপঢৌকন গ্রহণ না করিয়া, তাহার আবেদনের উত্তরে এই মর্ম্মে তাহাকে অনুমতি পত্র প্রদত্ত হউক যে, 'তুমি দত্তক গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। পূর্ব্বের ন্যায় তোমার স্বামীর নাম ও লৌকিক রক্ষা করিয়া তাঁহার উপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি তুমি ভোগ কর, তাহা

হইলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব। তোমার স্বামীর সম্পত্তির তুমিই প্রকৃত অধিকারিণী ; এ কারণে তোমার নিকট হইতে কোনও উপঢৌকন গ্রহণ করা হইল না। ভগবানের কৃপায়, এইরূপে উপঢৌকন গ্রহণ দ্বারা রাজ কোষের ধন বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা এখনও হয় নাই।" ইহা শুনিয়া কর্ম্মচারীগণ আবেদনকারিণীকে উপরি উক্ত মর্ম্মে অনুমতি পত্র লিখিয়া দিলেন।

অহল্যা বাইএর সম্বন্ধে মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত একটী গাথা।

সকল দেশেই, তত্তদ্দেশীয় মহাপুরুষদিগের জীবনের কোন ঘটনা, বা কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত কতকগুলি "গাথা" প্রচলিত থাকে। এই সকল গাথা প্রকারান্তরে ইতিহাস, বা জীবন-চরিতের কার্য্য করে। মহারাষ্ট্র দেশে এইরূপ যে সকল গাথা প্রচলিত আছে, 'শঙ্কর তুকারাম শালিগ্রাম' ও বোম্বাই এন্থ্রোপলজিকেল সোসাইটীর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট মিঃ আক্ওয়ার্থ (H. A. Acworth) নামক কোন গুণগ্রাহী ইংরাজ, তাহা সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। পাণিপথের মহাযুদ্ধ হইতে মহারাষ্ট্র সামন্ত বিশেষের মৃগয়া পর্য্যন্ত, নানা ঘটনা মূলক অনেকগুলি গাথা এই পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।* অহল্যা বাইয়ের সম্বন্ধে

---

* এই সকল গাথার সম্বন্ধে আক্ওয়ার্থ সাহেব তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে ;—

"With the Marathas, as with every warlike race, the

তাহাতে যে গাথাটী মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদান করিতেছি। অহল্যার প্রকৃতি ও ধর্মভাব কিরূপ ছিল, কিরূপ সুনিয়মে তিনি প্রজাপালন করিয়াছিলেন, আশ্রিত জনের প্রতি তাঁহার কিরূপ বাৎসল্য ছিল এবং তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন, এই গাথা হইতে তাহা পরিস্ফুট হইবে। *

(১)

কলিযুগে ধন্যা সতী অহল্যা রাণী।

(ও) যাঁর কীর্ত্তিতে ভরেছে ভুবন, নারীর মাঝে রত্ন খনি ॥

যাঁরে দেখলে নয়নে—পাপ্ না থাকে মনে,

রোগের জ্বালা পালায় দূরে এমনি "পুণ্য-পরাণী" ॥

---

feelings of the commons have taken shape in ballads, which, however rude and inartificial in their language, their structure, and their rhythm, are the genuine embodiments of **National enthusiasm**, and are dear, and deserve to be dear, to those who repeat and those who listen to them."

মহারাষ্ট্রীর গাথার সহিত অপর দেশীয় গাথার তুলনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—The songs of the Rajput glorify the valour of his individual ancestors in paltry internecine feuds; the scope of Moslem heroic poetry has a wider range, but its characteristic is religious fanaticism, and its inspiration is religion, **not patriotism**; but the ballads of the Marathas are the ballads of the men of Maharastra (the "Great Nation"), and as such, **burn through and through with patriotic fervour.**" Introduction to "Historical Ballads of The Marathas."

*আমাদিগের দেশেও পলাশীর যুদ্ধ, মহারাজা নন্দকুমারের হত্যা, তিতুমীরের লড়াই প্রভৃতি সম্বন্ধে এইরূপ গাথা প্রচলিত আছে। তাহা সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইবার যোগ্য।

মিলে সাধুজন যত তাঁর গুণ গান কত,

তিনি দৈববশে হ'লেন্ এসে হোল্কারের কুলের রাণী ॥

কত কঠোর ব্রত, পণ, তিনি কর্লেন উদ্যাপন্

হলেন্ ধর্ম্মবলে, পুণ্য ফলে, আপন কুল উদ্ধারিণী ॥

(ও) সেই মহেশ্বর ধাম যেথা কর্তেন অধিষ্ঠান

কাঙ্গাল গরীব গেলে সেথায় লভিত বিশ্রাম ;—

তিনি মাতা হয়ে দিতেন অন্ন, দীন হীনের জননী ॥

২

কত "দশ-রত্ন" ধন, দ্বিজে কর্তেন্ বিতরণ,

হরিনামে সদাই প্রীতি, পুরাণ পাঠে মন।

ও যাঁর বিপ্রগণে যজ্ঞসভা হত শোভাশালিনী ॥

নিত্য আদেশেতে যাঁর কত দ্বিজ সদাচার,

হোম কুণ্ডে হবিধারা দিতেন অনিবার,

তিনি সহস্র আহুতি দিতেন, এম্নি ব্রতধারিণী ॥

যিনি ব্রাহ্মণের করে অতি ভকতি ভরে

গড়াইলেন্ কোটীলিঙ্গ পূজ্তে শঙ্করে,

তিনি দুঃখী জনে বিবা (হ) দানে

হলেন্ কীর্ত্তি শালিনী ॥

যিনি পর্ব্বাহ ক্ষণে ধেনু দিতেন্ ব্রাহ্মণে,

শিশুগণে দুগ্ধ দানে বাঁচাতেন প্রাণে,

(ও) তাঁর করে সদা জপমালা, থাক্তো দিবা যামিনী ॥

৩

যত আছে তীর্থ ধাম্, কিবা 'মহাক্ষেত্র' নাম
"জ্যোতির্লিঙ্গ" আছেন যেথা নিত্য বিরাজ্‌মান্,
ও তাঁর অন্নসত্র আছে সেথায়, অন্নপূর্ণারূপিনী ॥
তিনি অন্ধ আতুরে সদা করুণা ভরে,
ঔষধি আর বস্ত্র দিতেন আপনার করে,
দিয়ে ব্রাহ্মণেরে অগ্নিহোত্র (হলেন) ধর্ম্মরক্ষাকারিণী ॥
বিনা ব্রাহ্মণ পারণ যাঁর না হ'ত ভোজন
দ্বিজ পাদোদক নিত্য করিতেন সেবন,
ও যাঁর রাম নাম গানে সদা পোহাইত যামিনী ॥

(৪)

যিনি তীর্থগ গণে সদা আনন্দ মনে;
পাদুকা, প্রাবরণ, অশ্ব দিতেন যতনে,
দিয়ে গুণী জনে স্বর্ণভূষা (ছিলেন) গুণের আদরকারিণী
প্রজায় করিতে রক্ষণ দেখ্‌লে দুষ্টমতি জন,
চরণে শৃঙ্খল দিয়ে করিতেন্ বন্ধন ;
(ও যাঁর) দেবতা-মন্দির শত ঘোষে কীর্ত্তি কাহিনী
দয়ার নাহি ছিল শেষ, যেথা নাইক বারিলেশ
জলাশয় দানে সেথা ঘুচাইতেন ক্লেশ;
তিনি স্নিগ্ধধারা ঢালি শিরে পূজিতেন শূলপাণি ॥

৫

যিনি পেলে গ্রহণ-মান, করতেন তুলা ব্রত দান

স্বর্ণ, রজত, ঘৃত, মধু, তিল্, তণ্ডুল্, ধান্য;

তিনি ছায়া দানে পান্থ জনের ছিলেন আতপবারিণী ॥

সদা কৃপাগুণে যাঁর, স্কন্ধে লয়ে বারি ভার,

রামেশ্বরে যেতেন কত সাধু সদাচার,

ও যাঁর সঙ্গে যেত তীর্থবাসে কত অনাথ দুঃখিনী ॥

হয়ে সংসারবাসী তিনি ছিলেন উদাসী,

(তাই) ভক্তি গুণে মুক্তি নিজে হলেন তাঁর দাসী;

হায়! ধরাতলে নাহি মিলে এমন ধন্যা রমণী ॥

কবি গঙ্গ হৈবতী বলে করি মিনতি,

গণনা তাঁর গুণের করি কিবা শকতি?

(মিলে) প্রভাকর, মহাদেব গুণী গায় তাঁর

গুণের কাহিনী ॥

পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ।